জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিকরা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। ইংরাজ আমাকে যখন বিদ্রোহী বলিয়া জেলে দেয়, তখনও সে নিজে আমার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে। আর আমি যতবারই জেল খাটিয়া থাকি না কেন, বাহিরে আসিলে, আর দশজনের মতন, বাজারদরে আমি বাজারে ইচ্ছামত পণ্যাদি কিনিতে পারিব না, এরূপ ত কখনও করে ন। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে যখন চাঁদপুরে ও গোয়ালন্দে "হরতাল" হইয়াছিল, তখন যাহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া গান্ধি-মহাত্মার পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ যাঁরা যে কারণেই হউক ইংরাজের চাকুরী করেন, তাঁহারা কন্‌গ্রেস কমিটির সহিকরা ছাড়পত্র ছাড়া বাজারে প্রতিদিনের খাদ্য দ্রব্য কিনিতে পান নাই। দোকানদারদিগের উপরে এমনই শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহারা এই ছাড়পত্র না পাইয়া কাহাকেও কোন বস্তু বেচিতে সাহস পায় নাই। এক যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ব্যতীত, আর কখনও সভ্যজগতে কোথাও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে এরূপ আক্রমণ হয় না। "শয়তানী" ইংরাজরাজের অধীনেও কোথাও এরূপ অত্যাচার দেখা যায় নাই। এইজন্যই ভাবিতে হয়, ইহাই যদি "স্বরাজের" অর্থ হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অযথারূপে কেবল নেতৃবর্গের প্রতাপ প্রতিষ্ঠার জন্য নষ্ট করিয়া যদি এই "স্বরাজ" পাইতে হয়, তবে এই "স্বরাজের" কোনও সত্য সার্থকতা থাকিবে কি না?

(৮)

স্বরাজ চাই, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, বিনাশের জন্য নহে। সমষ্টিকে আশ্রয় করিয়া সমষ্টির শক্তি ও স্বাধিকারের ভাগীদার হইয়া, ব্যষ্টির পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মচরিতার্থতা সাধনের জন্যই স্বরাজ চাই। এইজন্যই স্বরাজ এরূপ বহুমূল্য বস্তু। এইব্যক্তিগত স্বাধীনতাই মানুষের দেবত্ব-লাভের প্রধান সাধন। প্রাচীন সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রে আছে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান॥

আমি দেবতা, অপর কেহ নই; আমি ব্রহ্ম, শোকভাক্ নই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন। অর্থাৎ আমার প্রকৃতিতে, আমার অন্তরের ও আত্মার গঠনে, আমি জীব হইয়াও প্রকৃতপক্ষে শিবস্বরূপ। ঈশ্বর অংশে আমার উৎপত্তি। ঈশ্বরত্বলাভই আমার এই জীববিকাশধারার চরম লক্ষ্য। ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা এই লক্ষ্যলাভের সোপান। এই স্বাধীনতা যদি রক্ষিত এবং বর্দ্ধিত না হয়, তবে "স্বরাজ" দিয়া আমি কি করিব? তাহা হইলে, স্বরাজের কোনওরূপ পারমার্থিক সার্থকতা ত থাকে না।

আমরা স্বরাজ চাই, "স্বরাট্" হইবার জন্য। এই স্বারাজ্য আত্মার স্বারাজ্য। আত্মা ব্যষ্টিরূপেই আমাতে প্রকাশিত। এই আত্মা আমার অহং বস্তু। ইহা আমার আমিত্ব। এই অহং বস্তুকে, এই আমিত্বকে, এই ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিয়া যে স্বারাজ্য পাওয়া যায়, তাহাতে আমি কেবল একের দাসত্ব হইতে আর একজনের দাসত্বেই যাইব। আমার নিজের আমিত্বে, স্বামিত্বে, বা স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিব না, করিতেও পারিব না।

এই জন্যই জিজ্ঞাসা করি—কঃ পন্থাঃ?

এই কি স্বাধীনতার পথ?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

সামান্য ভাবেই হউক আর বিশেষ ভাবেই হউক জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথিকে স্মরণ করিবার পদ্ধতি আমাদেরও দেশে নূতন নহে; কোনো না কোনো প্রকারে বহুকাল হইতে ইহা প্রচলিত আছে। যাঁহারা নিজ নিজ গুণ ও কার্য্যের দ্বারা অ াধারণ, যাঁহারা মহান্, যাহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করি, তাঁহাদের ঐ স্মরণীয় তিথি সমূহ সাধারণ নহে। মহাপুরুষেরা পরলোক গমনের সময় যাহা লইয়া যান জীবলোকের পক্ষে তাহা অতি সামান্য, কিন্তু যাহা তাঁহারা রাখিয়া যান, জীব লোককে প্রদান করিয়া যান, তাহার তুলনা হয় না; যাহা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ, মানুষেরা তাহারই অধিকারী হয়। সে দুর্ভাগ্য, যে এই শ্রেষ্ঠ দানকে গ্রহণ করিতে পারে না। সংসারের কর্ম্ম প্রবাহে মানবের চিত্ত প্রায়ই ভাসিয়া যায়, স্থির থাকিতে পারে না। যাহা তাহার ধরিবার, ধরিতে পারে না, তাই লক্ষ্যেও পৌছিতে পারে না। কিন্তু তাহাকে সেখানে পৌছিতেই হইবে, আশ্রয়তরুর শাখা তাহাকে ধরিতেই হইবে, এবং এজন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তাহার চাই-ই-চাই। মহাপুরুষগণের জীবন-কথা এ বিষয়ে তাহাকে প্রভূত সাহায্য করে। শাস্ত্রে যাহা পড়া যায়, আচরণে তাহা দেখিলে, হৃদয়ে তাহা গভীরতর ভাবে প্রবেশ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই যখনি কোনো মহাপুরুষের জন্মতিথি বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, বস্তুতঃই তখন আমার হৃদয়ে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

সম্প্রদায় বিশেষের আবর্ত্তে ঘূর্ণিপাক খাইয়া মানুষের দৃষ্টি এত চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহার চিত্ত এতই দূষিত হইয়া উঠে যে, যাহা দেখিবার, যাহা শুনিবার, যাহা সত্য সে তাহা দেখিতে শুনিতে বুঝিতে পারে না। ইহাতে সেই সত্যের কোন ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় সেই মানুষেরই। জগতে এই জাতীয় মানুষেরই সংখ্যা অনেক, তাহাদের নিকট সম্প্রদায়টাই বড়, তাই সেই সম্প্রদায়ের বাহিরের কোনো কিছুকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহা যতই না কেন সত্য ও সুন্দর হউক। বস্তুত যাঁহারা মহান্ তাঁহারা কোন সম্প্রদায়েরই নহেন, তাঁহারা বিশ্ব-মানবের। সম্প্রদায় তাঁহারা নিজে রচনা করেন না, ইহা কালের ধর্ম্মে বা মানুষের ধর্ম্মে আপনা-আপনিই হইয়া পড়ে। যাঁহারা সত্য-সত্যই মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়মুক্ত করিয়াই দেখিতে হয়। আর দেখিবার সময় চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া অপক্ষপাতে দেখিতে হয়; অক্ষরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; এবং দেহের দিকে না তাকাইয়া প্রাণ বা আত্মার দিকে তাকাইতে হয়; তাহা হইতেই যাহা দেখিবার তাহা ঠিক দেখিতে পাওয়া যায়।

আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে মহাতপস্বীর তপস্যার প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, যে মহাত্মা আজ সত্যাগ্রহের পরম বাণী প্রচার করিয়া আত্মার পরম শুদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, গুর্জ্জর জননীই তাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন। আর আজ এক শত বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) কাঠিয়াবাড়ে সৌভাগ্যবতী সেই গুর্জ্জর জননীই

আর একটি তপোনিষ্ঠ পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইনিও সত্যের উপাসক হইয়া সত্য অর্থের প্রকাশ করিয়া মানবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইঁহারাই নাম স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। ইঁহার পরলোক গমনের এখনো চল্লিশ বৎসর হয়নি, ইঁহার জন্ম হয় ইংরাজী ১৮২৪ সালে, আর মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালে। তিনি জীবিত ছিলেন ৫৯ বৎসর মাত্র। স্থূলত ইঁহার জীবনকে প্রায় সমান-সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা (১) গৃহবাস ২১ বৎসর (১৮২৪-১৮৪৫), বিশেষ অধ্যয়ন ও ভ্রমণ ১৮ বৎসর (১৮৪৫-১৮৬৩), এবং সাধারণ লোককার্য্য ২০ বৎসর (১৮৬৩-১৮৮৩)। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল মূ ল শ ঙ্ক র।

ইঁহার পিতা একজন ধনশালী ও পরম শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু পিতার ধন ও ধর্ম্ম উভয়ই পুত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারে নি। মূলশঙ্করের গৃহ জীবনের কথা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, বাল্য হইতে তিনি অত্যন্ত যুক্তিপ্রিয় ছিলেন। ইহা হইয়া আসিতেছে, এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। 'কেন'র উত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। এই যুক্তিপ্রবণতাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাকে স্বামী দয়ানন্দ সংস্বতী করিয়াছিল। মূলশঙ্করের বাল্য জীবনের দুইটি কথা বা ঘটনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই তাঁহাকে সত্যানুসন্ধানে প্রথম প্রবল প্রেরণা দিয়াছিল। বলিয়াছি, তাঁহার পিতা অতি শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুত্র এক শিব রাত্রির দিন পিতার আদেশে, তাঁহার সহিত পূজা করিবার জন্য, এক শিব মন্দিরে গমন করেন। গভীর রাত্রিতে, পুজকেরা এমন কি তাঁহার পিতাও নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, তিনি দেখিলেন, একটা ইঁদুর শিবলিঙ্গ প্রতিমার উপর উঠিয়া তাহা দূষিত করিতেছে। মূলশঙ্করের হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল 'এই কি দেবতা?' তিনি তখনি পিতাকে জাগাইলেন, প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু পিতা উত্তর দিয়া পুত্রকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না, পুত্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার হৃদয়ের ভাব এইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। যদিও পরিবারের অন্যান্য লোকেরা ইহার বিশেষ কোনো সন্ধান পাইল না। এই সময়ে মূলশঙ্করের বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

দ্বিতীয় ঘটনা, ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার হৃদয়ে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয়। একদিন মূলশঙ্কর যখন অন্যান্য ব্যক্তির সহিত একটি সঙ্গীতোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল তাঁহার ছোট ভগিনীর কলেরা হইয়াছে। চিকিৎসা হইল, ফল হইল না, বালিকার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শোকবিকল আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দেখা গেল মূলশঙ্কর ধীর-স্থির-অচল হইয়াছিলেন, যেন তাঁহার কোনো শোকই হয় নি। জীবনে ইহাই তাঁহার প্রথম শোক। তাঁহার হৃদয়ে ইহা গভীর রেখা পাত করে। কপিলবাস্তুর শাক্য কুল রাজপুত্রের ন্যায় ইঁহারো হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল 'মৃত্যুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, আমারো একদিন এই অবস্থা হইবে। মানবের এই দুঃখকে কিরূপে এড়াইতে পারা যায়? কোথায় গেলে মুক্তি পাওয়া যাইবে?' তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যেরূপে হউক আমাকে ইহার অনুসন্ধান করিতেই হইবে!' তাঁহার মনের ভাব অন্তে জানিল না, ভিতরে ভিতরে তাহার কার্য্য চলিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার এক প্রিয় বিদ্বান্ পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। মূলশঙ্করের হৃদয়ের পূর্ব্ব ভাব আরো দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন

সংসারে সমস্ত অনিত্য, জীবনের উপভোগ্য কিছু নাই। সংসার সুখ ভোগ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি "পুত্রৈষণা" ও "বিত্তৈষণা" কে চিরদিনের জন্য হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিলেন। এবং এইরূপে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পুত্রের হৃদয়ের ভাব পিতা-মাতার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে নাই, বিবাহ বন্ধনে বন্ধন করিবার জন্য তাঁহারা কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি, কিন্তু মূলশঙ্কর সেই চেষ্টাকে সফল হইতে দেন নি। রাত্রিতে নির্জ্জনে তিনি জন্মের মত গৃহত্যাগ করেন। পিতা অনুসন্ধানের জন্য অশ্বারোহী ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি ধরাও পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মন যখন যাহার মুক্ত তখন তাহাকে কে বন্ধন করিবে? তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর

ব্রাহ্মণের প্রাচীন রীতি অনুসারে ৮ম বর্ষেই তাঁহার উপনয়ন হয়। ১৯ বৎসরের পূর্ব্বেই তিনি সমগ্র যজুর্বেদসংহিতা (শুক্ল) ও অন্যান্য বেদের কিছু কিছু অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপনয়নের পর গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায় হইতেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ২১ বৎসরের মধ্যে তিনি নিঘণ্টু, নিরুক্ত, কল্প ও পূর্ব্বমীমাংসাদি অধ্যয়ন করেন। শৈশবে যে বেদবিদ্যায় তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ পরবর্ত্তী জীবনে সেই বেদবিদ্যারই উপর তাঁহার সমস্ত কার্য্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। বেদবিদ্যারই মধ্যে তিনি সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গৃহত্যাগ করিয়া মূলশঙ্কর লক্ষ্যের অনুসন্ধানে দুর্গম পথের দ্বারা দূর দূরতর স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি লালা ভগত রায়ের * নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইহার পরে নানা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয়। কাশী প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করেন, এবং নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হন। এই স্থানে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল তখন দয়ানন্দ সরস্বতী। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। ইহার পর নানা স্থানে ঘুরিয়া যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করেন। হিমালয় প্রভৃতি যে সমস্ত তীর্থ স্থলে তপস্বী ও জ্ঞানী সাধুগণের থাকিবার সম্ভাবনা দুর্গম হইলেও তিনি সেই সমস্ত স্থানে পর্য্যটন করিতে বিরত হন নি। কিন্তু বহু স্থানেই নিজের অভীষ্ট লাভ করিতে তিনি পারেন নি। তথাপি তিনি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হন নাই। উপনিষৎ খুলিলেই দেখা যায় বিনা তপস্যায় কিছু হইবার উপায় নাই, যিনি যেখানে কোনো সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বিনা তপস্যায় তিনি তাহা পান নাই। শিষ্য উপস্থিত হইলে গুরু সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তার পর উপযুক্ত দেখিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেন, আর শিষ্যও তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। উপনিষদের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং প্রাচীন শাস্ত্রে ইহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। দয়ানন্দ যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূলে পূর্ব্বোক্ত তীব্র যুক্তিপ্রবণতা ও বৈরাগ্য এবং এই তপস্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* কেহ কেহ বলেন, লালা ভগত রামের।

জীবনের ৩৬ বৎসর তাঁহার এইরূপে যায়। তখনো তিনি কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি, তখনো তাঁহার সময় উপযুক্ত হয় নি, ভবিষ্যতে যে গুরুভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে তখনো তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নি।

দেশের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিবিধ অবস্থা তাঁহার চক্ষু ও চিত্তকে এড়াইয়া থাকিতে পারে নাই। তিনি ইহা তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিরূপে সেই দুরবস্থা বিনষ্ট হইয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইতে পারে তিনি তাহা ভাবিতেন। তিনি দেখিয়াছিলেন দেহের এক অঙ্গের উন্নতিতে কিছুই হয় না, সমস্ত অঙ্গ পুষ্ট হইলেই দেহীর যথার্থ পুষ্টি হয়। তাই আমরা তাঁহার পরজীবনে দেখিতে পাই তাঁহার সংশোধক বা সংস্কারের দৃষ্টি কোনো এক বিশেষ দিকে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান যুগে রাজ ধর্ম্মের ও কথা না বলিয়া ছাড়েন নি।

ধর্ম্মকেই তিনি নিজের সমস্ত কার্য্যের ভিত্তি করিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। যাহা ধর্ম্ম তাহা মঙ্গল, অতএব যে শাস্ত্র ধর্ম্মকে প্রকাশ করে, তাহা মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল উপদেশ দিতে পারে না। ধর্ম্মের মধ্যে যদি কিছু অমঙ্গল দেখা যায়, তিনি ভাবিতেন, তবে তাহা শাস্ত্রের উক্তি নয়, যে শাস্ত্র অমঙ্গলের কথা বলে তাহা শাস্ত্র নহে। তাই ধর্ম্মের সংস্কার, শাস্ত্রের যুক্তিযুক্ত যথাযথ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। তাই তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়াছিল শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রথম হইতেই বেদে ও বৈদিক ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তখন তিনি চঞ্চল হইলেন, বেদ উপনিষদের রহস্য তাঁহাকে জানিতে হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে স্বামী দয়ানন্দ মথুরার সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডী বিরজানন্দ স্বামীর নিকটে আগমন করেন। ইনি অতিশয় তেজস্বী ও বিদ্বান ছিলেন। ইনি অন্ধ ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞা চক্ষু ছিল। দয়ানন্দ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। দেখা গিয়াছিল গুরু শিষ্যেরও প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছিলেন। বিরজানন্দ স্বামীর আর্ষ গ্রন্থেই একমাত্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, অনার্ষ গ্রন্থকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি স্বামীজীকে বলিয়াছিলে আগে যে অনার্ষ গ্রন্থ পড়িয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও, তাহা না হইলে আর্ষ গ্রন্থের মহিমা তোমার নিকট প্রতিভাত হইবে না।" এরূপ কথা কেহ কখনো তাঁহাকে বলেন নি। শিষ্যের ইহা মনের অনুকূলই হইয়াছিল। এই সময়ে দয়ানন্দের বয়স ৩৫।৩৬ বয়স হইবে। আড়াই বৎসরের পরে অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে গুরু বলিয়াছিলেন 'বৎস, আমি গুরু দক্ষিণা চাই। শিষ্য বলিলেন গুরুদেব, আমার এখন কি আছে যাহা আপনাকে অর্পণ করিতে পারি?' গুরু বলিলেন দক্ষিণা না পাইলে তো আমি তোমাকে যাইবার অনুমতি দিব না। আর এমন কিছু চাহিব না যাহা তোমার আয়ত্ত নহে।' শিষ্য বলিলেন 'তবে আদেশ করুন।' গুরু বলিলেন 'বৎস, তুমি যাও, দেশে যে অজ্ঞানতা চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে তুমি তাহা দূর করিয়া নিজের অধ্যয়নকে সার্থক কর!' শিষ্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে নবীন দৃশ্য প্রতিভাত হইল। এখন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কের

অভিনয় আরম্ভ হইল। এই শেষ কুড়ি বৎসরের কার্য্যেই দয়ানন্দ স্বামী দ য়া ন ন্দ স্বা মী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মথুরা হইতে নির্গত হইয়া স্বামীজী রাজপুতানা ও অন্যান্য বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৌরাণিক ধর্ম্মকে খণ্ডন করাই ইহার প্রধান বিষয় ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও তদন্য ধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদনের জন্য তিনি তিনটি উপায় অবলম্বন করা স্থির করিয়াছিলেনঃ—১ম, প্রচার করা, বক্তৃতা করা, ও শাস্ত্রার্থ বা তর্ককরা; ২য়, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া। এবং ৩য়, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া, গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বৈদিক মন্ত্রের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করা, যাহাতে সাধারণে বৈদিক ধর্ম্মকে বুঝিতে পারে।

তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। হরিদ্বার, কানপুর, কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ স্থানে বড়-বড় সভায় বহু-বহু লোকের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গণের সহিত তাঁহার ভীষণ তর্ক হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের মধ্যে যাহা কিছু অবৈদিক বা কুৎসিত বা অনুচিত বা অপ্রামাণিক দেখিয়াছিলেন, নির্দ্দয় ভাবে কঠোর যুক্তিতে তৎসমুদয় খণ্ডন করিতেন। ইহার মধ্যে প্রতিমা পূজা একটি প্রধান বিষয় ছিল। তিনি তর্ক করিয়া যুক্তি দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা অবৈদিক, ইহাতে সুবিধার পরিবর্ত্তে বরং নানা অসুবিধাই হয়, এবং সেই জন্যই ইহা ত্যাজ্য। তিনি হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানারূপ পূজা, গয়াশ্রাদ্ধ, জগন্নাথাদি দেবতা, গঙ্গাস্নান, গুরুমাহাত্ম্য তন্ত্র, পুরাণ, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়কে (সত্যার্থ প্রকাশ ১১শ সমুল্লাস) কঠোর ভাবে এক দিক্ হইতে খণ্ডন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি জাতি ভেদের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানিতেন বটে, কিন্তু তাহা গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে, জন্ম অনুসারে নহে। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই এই সব সম্বন্ধে ঘোর তর্ক বিতর্ক উঠিত। স্বামীজীর সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠা বড় সহজ ছিল না। লোকে ক্রমশঃ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রচলিত হিন্দু সমাজ, বলা বাহুল্য, তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ভাবিল তিনি যেন সকলকে খ্রীষ্টান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কাশী হইতে তিনি কলিকাতায় আসেন (১৮৭৩ ডিসেম্বর)। এখানেও তিনি বহু বক্তৃতা করেন, ও পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বহু বিচার হয়। ব্রাহ্মসমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়। এখানে সেই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে তাঁহার ক্ষেত্রটা অনেকটা পরিস্কৃত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের বহু সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগকে তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞোপবীত ধারণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারেন নি।

স্বামীজী এতদিন কেবল সংস্কৃতেই বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেন, কিন্তু পরে কেশব চন্দ্র সেনের পরামর্শে তিনি তাহা প্রধানতঃ হিন্দীতেই করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপনের আবশ্যকতা আছে, ইহাও অনুভব করেন।

কলিকাতা হইতে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ ও প্রচার করিয়া বোম্বাই গমন করেন। নবেম্বর (১৮৭৪) সেখানেও তাঁহার বিচার-প্রচার সমস্তই পূর্ব্বের মত হইয়াছিল। এই সময়ে সেখানে নব্যশিক্ষিতেরা "প্রার্থনা সমাজের প্রভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। তিনি কলিকাতায় "ব্রাহ্মসমাজ" ও বোম্বাইতে "প্রার্থনাসমাজ" দেখিয়া "আর্য্যসমাজ" স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৭৫ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই সহরে সাধারণ সভা করিয়া প্রথম "আর্য্যসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইল।

আর্য্য সমাজের কয়েকটি নিয়ম এই :—

(১) সত্য জ্ঞান ও সত্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থের মূল ঈশ্বর।

(২) বেদই সত্য শাস্ত্র, প্রত্যেক আর্য্যেরই ইহার অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শ্রবণ, ও প্রচার কর্ত্তব্য।

(৩) সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ন্যায় অন্যায় অনুসন্ধান করিয়া, ধর্ম্ম অনুসারে করিতে হইবে।

(৫) আর্য্যসমাজের মূল উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ করা—যাহাতে সকলের শারীরিক আধ্যাত্মিক ও সমাজিক মঙ্গল হয়।

বোম্বাই সহরে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি পুনায় গমন করেন। সেখানেও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা করিয়া প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত তর্ক-বিতর্কও বিষম হইয়াছিল।

কেবল হিন্দুসমাজের সঙ্গে নহে, মুসলমান ও খ্রীষ্টানসমাজের সঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্ক করিতে হইয়াছিল। মৌলবী ও পাদরী গণের সঙ্গে তাঁহার বহু বিচার হইয়াছিল। এক ধর্ম্ম-মেলায় (চন্দাপুর, শাজাহানপুর, ১৮৭৭ সাল) মৌলবী ও পাদরীগণের সহিত তাঁহার বিচার্য্য বিষয় সমূহের মধ্যে একটি ছিল এই যে—"বেদ, কোরান, ও বাইবেল এই তিনের মধ্যে কোন্ খানিকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া স্বীকার করিবার প্রমাণ আছে; সকলেই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া বিচার করিয়াছিলেন, ও মনে করিয়াছিলেন জয় হইয়াছে তাঁহারই। বস্তুতঃ এ সব বিচারের ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

স্বামীজী রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিম, বড়িলা, বোম্বাই ও গুজরাট প্রভৃতি স্থানে নিজের বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফল তেমন কিছুই হয় নাই—যদিও সর্ব্বত্র তাহার আন্দোলনের একটা প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি পঞ্চনদে প্রথম প্রবেশ করিলেন (১৮৭৭) তখন দেখা গেল, বেদবিদ্যার ও বৈদিক ধর্ম্মের সেই পরিচিত প্রাচীন ভূমিতে দেখিতে দেখিতেই, তাহারা উভয়েই স্বামীজীকে উপলক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। আজ যদিও দূর হইতে দূরতর স্থানে দেশ হইতে দেশান্তরে স্বামীজীর প্রচারিত আর্য্যধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তথাপি পঞ্জাবেই ইহা সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ সালের ২৬শে জুন তারিখে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নূতন আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং বোম্বাই-এ আর্য্যসমাজ স্থাপনের সময় বিহিত নিয়মগুলিকে এই সময় পুনর্ব্বার সংশোধন করিয়া লওয়া হইল। লাহোর আর্য্যসমাজের সভাসদেরা যখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাকে সমাজের গুরুর পদবী গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তিনি কহিলেন, গুরু হইতেছেন পরমপিতা পরমেশ্বর, গুরুরাজ

ভগ্ন করাই আমার উদ্দেশ্য, তাহার প্রচার করা নহে; সভাসদেরা তাহার কথা শুনিয়া আবার যখন বলিলেন আচ্ছা তবে আপনি আমাদের পরম সহায়কের পদ গ্রহণ করুন।' স্বামীজী তখন বলিলেন 'তোমরা যদি আমাকেই পরম সহায়ক বল, তবে ঈশ্বরকে কি বলিবে? তোমরা আমাকে সহায়ক মাত্র জানিও।"

লাহোরে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত তিনি পঞ্জাব ও যুক্ত প্রান্তে পর্য্যটন ও প্রচার করেন। এইসময় থিয়োসফিকাল সমাজের নেতাদের সহিত ইহার আলাপ পরিচয় আলোচনা হইয়াছিল। কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাবাৎস্কি ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন থিয়োসফিকাল সোসাইটীর সহিত আর্য্যসমাজের একটা যোগ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকে নাই।

স্বামীজী ইহার পর (১৮৮১ সাল ১০ই মার্চ) রাজপুতানায় দীর্ঘ পর্য্যটনের জন্য নির্গত হন। সেই সময়ে উদয়পুরের মহারাণা সজ্জনসিংহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মহাশয় এই সময় মহারাণার রাজসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বামীজী এখানে দীর্ঘ দিন থাকিয়া মহারাণাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি এখানে "পরোপকারিণী" নামে এক সভা স্থাপন করিয়া নিজের যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি পুস্তক ও ছাপাখানা ইত্যাদি ছিল সমস্তই এই সভার হস্তে প্রদান করেন। সভা অনতিবিলম্বেই ২৪ হাজার টাকা তুলিয়া নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

উদয়পুর হইতে তিনি শাহাপুর গিয়া যোধপুরে আগমন করেন।

স্বামীজী সেখানে সাধারণ বক্তৃতা ও প্রচারের কার্য্য ছাড়া যোধপুরাধীশ মহারাজা বলবন্ত সিংহজীকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিতেন।

এখানে ১৮৮৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর স্বামীজী নিজের পাচকের হাত হইতে দুগ্ধ লইয়া পান করেন। একটু পরেই তাঁহার পেটে অত্যন্ত বেদনা আরম্ভ হইল, তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। শুনা যায় পাচক অন্যের প্রেরণায় ধনলোভে অতি সূক্ষ্ম কাচচূর্ণকে চিনির সহিত দুধের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছিল। স্বামীজী পাচকের এই অপকার্য্যের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাচক ইহা তাঁহার নিকট স্বয়ং স্বীকার করে। কতটাকার জন্য সে এই অপকার্য্য করিয়াছে তাহা তিনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে সেই টাকা দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি এই টাকা লইয়া এখনি এই দেশীয় ও ইংরেজ রাজ্য ছাড়িয়া নেপালের দক্ষিণে পলায়ন কর। মহারাজ বলবন্ত সিংহ তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। পাচক প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। এদিকে স্বামীজীর পীড়া ক্রমশঃ গুরুতর হওয়ায় সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে প্রথমে আবুতে ও পরে আজমীঢে আনয়ন করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। ৩০শে অক্টোবর (১৮৮৩) অপরাহ্ণে তাঁহার অবিলম্বে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহার পর শুইয়া পড়িয়া সন্নিহিত সকলকেই সম্মুখ হইতে পশ্চাতের দিকে যাইতে বলিলেন, উদ্দেশ্য তাঁহার সম্মুখে আসিলে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ হইবে। সকলে সরিয়া গেলে

ভগবানের গুণপ্রকাশক একটি হিন্দিগান করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সন্ধ্যা ৬টার সময় স্বামীজী দেহত্যাগ করিলেন। সে দিন দীপান্বিতা অমাবস্যা; তাঁহার অভাবেই সঙ্গে সঙ্গে যেন চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু পর ক্ষণেই চতুর্দ্দিকে দীপাবলীর দীপলেখা জ্বলিয়া উঠিল, অন্ধকার তিরোহিত হইল। মনে হইল স্বামী দয়ানন্দের সত্য দীপই সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া থাকিল। যেন তিনি শোকমুগ্ধ শিষ্যগণকে আশ্বাস দিয়া গেলেন—'বৎসগণ, আমি চলিলাম, কিন্তু ঐ দেখ আমার সত্য দীপ চারিদিকে জ্বলিয়া থাকিল, তাহাই তোমাদিগকে চালিত করিবে।

স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি তিনি বস্তুতই সত্যের উপাসক ছিলেন। যদি তিনি বুঝিতেন ইহা সত্য তবে তিনি তাহা অনুসরণ ও প্রচার করিতেন তাহা যতই না কেন দুষ্কর হউক। এ জন্য তিনি নিন্দা-স্তুতি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি সত্যার্থ প্রকাশের ভূমিকায় বলিতেছেন—"সত্য অর্থের প্রকাশ করাই আমার এই গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন। 'সত্য অর্থের প্রকাশ' বলিতে আমি ইহাই বুঝি যে, যাহা সত্য তাহাকে সত্য এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা। সত্য বলিতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, যাহা যেরূপ তাহাকে সেইরূপই বলা, লেখা ও মান্য করা। কাহারো মনে কষ্ট দেওয়া বা কাহারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই। যাহাতে মানব জাতির উন্নতি ও উপকার হয়, মানবেরা যাহাতে সত্য-মিথ্যা জানিয়া সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে বর্জ্জন করিতে পারে তাহাই করা ইহার তাৎপর্য্য। সত্যের উপদেশ ছাড়া মানবজাতির উন্নতির অন্য কোনো উপায় নেই।"

স্বামীজী স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম কেবল স্বদেশেই আবদ্ধ হইয়াছিল না তিনি কেবল ভারতবাসীরই কল্যাণ চিন্তা করেন নাই, তিনি মানবজাতিরই কল্যাণ চাহিয়াছিলেন। তিনি যখন বেদকেই ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন তখন বেদান্ত ধর্ম্ম যে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গললাভের জন্য তাহা তাঁহার বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় নি। তাই তাঁহার বৈদিকধর্ম্মের গ্রহণে কোনো দেশের কোনো জাতির কোনো লোকের বাধা তিনি দেখিতে পান নি। জাতিবাদের কোনো বন্ধন ইহার মধ্যে নাই। বিশেষ কোনো জাতিতে বা বিশেষ কোনো বংশে জন্মিলে যোগ্যব্যক্তিরও বেদোক্ত ধর্ম্মে অধিকার থাকিবে না ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নি, আর তাঁহার মত লোক ইহা ভাবিতে পারেনও না। তাই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে মুসলমান পর্য্যন্তও স্থান পাইয়াছে। তথাকথিত অস্পৃশ্য অপাঙ্‌ক্তের জাতিরাও আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় স্বামীজী মানবজাতির সমগ্র অঙ্গেরই পুষ্টিকে যথার্থ কল্যাণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অঙ্গবিশেষের পুষ্টি তাঁহার মতে পুষ্টিই নহে। এইজন্যই স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম্ম খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচারকে অনেকটা বাধা প্রদান করিতে পারিয়াছিল।

স্বামীজীর দৃষ্টি কেবল ধর্ম্মসংস্কারেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি সমাজের বিভিন্ন বিষয় সমূহের সংস্কার করিয়াছিলেন। দেশের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ উন্নতিরই দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এই সমস্ত সংস্কার করিতে গিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার

ন্যায় যুক্তিপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বুঝা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, যুক্তি তর্ক দ্বারা যথাযথরূপে সমস্ত বুঝাইয়া না দিলে কেবল অনুশাসনের দ্বারা লোকে বুঝিতে পারিবে না। তাই তিনি যেদিকেই যাহা কিছু করিতে গিয়াছিলেন সেই সমস্তকেই নানারূপ যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারের কার্য্য এইরূপেই চলিয়াছিল।

শিক্ষাসংস্কার তাঁহার অন্যতম প্রধান কার্য্য। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে শারীরিক ও মানসিক কোনো শিক্ষাই উপযুক্ত হইতে পারে না। তিনি প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষণীয় বিষয় সমূহকে প্রাচীনেরই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নি, নবীনকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ও নবীনের যথাযথযোগেই তাঁহার শিক্ষাবিধি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

তিনি কেবল বালকগণেরই শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া নিবৃত্ত ছিলেন না, স্ত্রীশিক্ষাতেও তাঁহার সমান উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কন্যাগণকেও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইহা কেবল যুক্তিতে নহে, বৈদিক প্রমাণেও তিনি ব্যবস্থাপিত করেন। ইহারই পরিণামে আজ আর্য্যসমাজে বহু কন্যাপাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছে। কন্যাপাঠশালার ছাত্রীগণের সংস্কৃত ভাষার পটুতার কথা অনেকেই জানেন। স্বামীজী পুত্র-কন্যা উভয়েরই শিক্ষাকে অবশ্য বিধেয় (compulsory) করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

বাল্যে বা অকালে বিবাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া স্বামীজী সমাজের আর এক দিকে বহুকল্যাণ সাধন করেন। পতিপুত্রহীনা বিধবাগণের সন্তান লাভের জন্য তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের নিয়োগবিধির অনুমোদন করেন। বর্ত্তমানযুগে নিয়োগ সম্বন্ধে লোকমত অতিবিরুদ্ধ থাকিলেও স্বামীজী যে, অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নারীজাতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে তিনি বিধবা বিবাহের বিধান করিয়াছিলেন।

স্বামীজী গোরক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এসম্বন্ধে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরও সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে ছাড়েন নি, আন্দোলনও অনেক করিয়াছিলেন। গোরক্ষা হইলে ভারতের কত দিকে কত উন্নতি হইতে পারে ইহা তিনি তলাইয়া বুঝিয়াছিলেন। স্বামীজীর মাতৃভাষা ছিল গুজরাতী, কিন্তু প্রচারের জন্য তিনি হিন্দী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা হিন্দীর প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রচারের তখন বাধা হয় নাই। ইংরাজী না হইলে আজকাল ভারতেও প্রচার করা শক্ত, কিন্তু আশা হয়, কিছু দিন পরে আবার হিন্দীতেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য চলিবে।

বৈদিক ধর্ম্মের সহিত স্বামীজী বৈদিক সাহিত্যেরও বহু প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত বেদব্যাখ্যা-প্রণালীর সহিত অনেকে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনার দিকে তিনি যে দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

তাঁহার স্থাপিত আর্য্যসমাজের প্রভাব ও কার্য্য আজ কেবল ভারতেরই মধ্যে নহে; ইহার বাহিরেও অনুভূত হইতেছে। আর্য্যসমাজের কার্য্য উৎসাহ ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তাহার লোকহিতকর কার্য্য নিজেই পুরস্কৃত হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

স্বরাজ সাধনায় নারী।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটির পর্য্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচনা আজ সে নয়। বর্ত্তমান কালে যে তিনপ্রকার ভয়ানক দুঃখের মাঝখান দিয়ে জন্মভূমি আমাদের গড়িয়ে চলেচে, সেও তিন প্রকার সত্য, কিন্তু সে হচ্ছে, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু, এ কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারি, এই তিনটিই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, এবং রাজনীতির মধ্যেই আমাদের সকল কষ্টের, সকল দুঃখের অবসান। হয়ত একথা সত্য, হয়ত নয়, হয়ত বা সত্যে মিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ কথাও কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, মানুষের কোনো দিক দিয়েই দুঃখ দূর করবার সত্যকার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সর্ব্বথা, সর্ব্বকালেই আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা, সকলেই যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে না ও পাই, যে দাগ গুলো কেবল স্থূল দৃষ্টিতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক স্পষ্ট দুঃখ গুলো—কেবল এই গুলিই যদি প্রতিকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের স্কন্ধ থেকে একটা মস্ত গুরুভারই সরিয়ে দিতে পারি।

তোমাদের দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্কালে, তোমাদের অধ্যাপক এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয়, এই শেষের দিকের অসহ্য বেদনার গোটা কয়েক কথা, তোমাদের মনে করে দিবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমিও সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। এই সুযোগ এবং সম্মানের জন্য তোমাদের এবং তোমাদের গুরুস্থানীয়দের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।*

এই সভায় আমার ডাক পড়েচে দুটো কারণে। একেত মৈত্রমশাই আমার বয়সের সম্মান করেছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে আমি অনেক দিন ধরে অনেক ঘুরেচি। ছোটবড়, উঁচুনীচু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে রেখেচি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, এবং এর মধ্যে যত অত্যুক্তি আছে, তার জন্য আমাকেও দায়ী করা ; চলে না। তবে, হয়ত, কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। দেশের নব্বুই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পড়েচি, এবং তাঁদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাঁদের সেই সব অসহ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় দুঃখ দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু, কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, যখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করা আমার কতটুকু অধিকার আছে! যাকে দিই নি, তার কাছে

* পুজাবকাশের পূর্ব্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত।

প্রয়োজনে দাবী করি কোন্ মুখে? কিছুকাল পূর্ব্বে নারীর মূল্য বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি, সেই সময় মনে হয় আচ্ছা, আমার দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু, আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? বিস্তর পুঁথি পত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায়, এবং অবিচার সর্ব্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কমবেশী প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেচেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে! স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবী জোড়া যুদ্ধে, পুরুষে যখন মারামারি কাটাকাটি বাধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হল, এই রক্তারক্তিই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই। এই দারুণ দুর্দ্দিনে নারীর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে তার বাধ্‌লনা। আমি ভাবি, এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসার-ব্যাপী নরযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ আজ কি হত? অথচ, এ কথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধে নি।

আজ আমাদের ইংরাজ Goveranment এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, তিনি কেবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া জ্যোঠাদের ক্রোধাক্ত মুখ গুলি ভারি মনে পড়ে। এবং সেই সকল মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তাও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যাপণের বিরুদ্ধে মস্ত হৈ চৈ করে তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে দিইনে কেন?

আমি বলি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপাল তুলে বলেন, সে কি মশায় কন্যা দায় যে।

আমি বলি, তাহলে কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতিকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করবার ও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের সুমুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে তাকে বোষ্টম হতে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতা কর্ণ হতে বলায় লাভ হবে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরেও না, তাঁকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতিকার মেয়ের বাঁপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়ীই আমার কথা বোঝেন না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে বলেন, 'সে কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে!' কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুনতে হয় বটে, কিন্তু আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনো দল বেঁধে হয় না! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে মেয়ে, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সে—ই

কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়ে মানুষকে মানুষ করার ভার ও তারই উপরে এবং এইখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বল্‌তে হয় বলেই বল্‌চিনে, সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করচিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই একথা বল্‌চি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্চেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্চেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুদ্ধমাত্র চরকা কাটিতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাক্‌বে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেচি মানুষ হতে দিই নি স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেচে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!

এইখানে একটা আপত্তি উঠ্‌তে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছ ও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রাখ্‌তে চেয়েচে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী একে ফাঁকি দিয়ে যে কেউ যে-কোন-একটা-কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হতে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেম্‌নি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেচে। একথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য! Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হতে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হয়েছে 'all my life I have been but a slave driver!' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় যে গ্লানি অঙ্গীকার করে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর (সমাজতত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতার শৃঙ্খল ও তাদের তেম্‌নি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ

তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখ্‌তে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক্ এই আশঙ্কাই আমার বুকের ওপর জাঁতার মত বসে আছে। মনে হয় এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকি রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশ ও ত আজ ও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি; অথচ তাদের স্বাধীনতা ও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমি ও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজ ও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈব বলের অভাবে যদি কখনও ও বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্র ও নড়াতে পারবেনা। শুধু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্ম দেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিলনা। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করে ছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে সুরু করে-ছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক শহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েচি, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিস তারা আজও হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকেই একটা ফেটিস্ করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ কোরে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, আজ ও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখ্‌তে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত, আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙ্‌বে এই সমবেত নরনারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্‌বে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্, খসে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেচে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজন ও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট গৌরব, বিলুপ্ত সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখ্‌তে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলেনা, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এই খানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চির জীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও। তা' সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দরিদ্র জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এই টুকু দিয়েই অত্যন্ত

জটিল সমস্যার এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা করে ফেলি। আমি বলি মেয়ে মানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি-ডোমকেও যদি মানুষ বল্‌তে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও বল্‌তে নেই ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝনা—এস আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকে ও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশি চলা-ফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙে দেব। দীর্ঘ দিন বর্ম্মা দেশে থেকে এটা আমার বেশ কোরে শেখা, যে মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে মেলাই তার হিত করবার আবশ্যক নেই।

আমি বলি যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে যদি ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে, রাগ করবারই বা কি আছে! ছুটো সুপরামর্শ দিতে পারি,—কিন্তু মেরে ধরে হাত পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায় ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুঁড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে কোরত ত তারাও আরামে থাকৃত এদের ও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু আধটু হবার ও যায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার, তোমরা ভুলোনা।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বল্‌বার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি কোরে সমস্ত বাঙ্‌লা জীর্ণ হয়ে আস্‌চে,—দেশের যারা মেরু-মজ্জা সেই ভদ্র গৃহস্থ পরিবার কি কোরে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, সে ধর্ম্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রাম গুলা প্রায় জন শূন্য,—বিরাট প্রাসাদ তুল্য আবাসে শিয়াল কুকুর বাস করে, পীড়িত, নিরুপায় মৃতকল্প লোক গুলো যারা আজ ও সেখানে পড়ে আছে, খাদ্যাভাবে, জলাভাবে কি তাদের অবস্থা,—এই সব সহস্র দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সামনে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হলোনা। তোমরা ফিরে এস, তোমাদের অধ্যাপক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব। আজ আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে উপদেশ।

শুনেছি মুদীরা জমাখরচের হিসাবে আধপয়সার গরমিল মেলাবার জন্য চার পয়সার তেল পোড়ায়। আমরা এই রকম অনেক সময় ছেলেদের জমা খরচ মেলাবার চেষ্টা করি। শতকরা কত ছেলে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, তারই দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কত কমে গিয়েছে, অধ্যাপকের সংখ্যা ও বেতন কত কমাতে হবে, এই হিসাব মেলাতে সকলে ব্যস্ত, কিন্তু এ দিকে বহুমূল্য জীবন-তেল যে পুড়ে যাচ্ছে, তার হিসাব নিকাশ করবার অবকাশ আমাদের নাই। এই বাঙ্গালা দেশে জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় একলক্ষ অধিক। বিলাতের মতন স্বাধীন দেশে মৃত্যুর চেয়ে জন্ম হাজারে ১১ বেশি, অর্থাৎ, আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের মতন যদি বছরে তাদের দেশে আঠার লাখ মরে, জন্মায় আঠার লাখ কুড়ি হাজার। জাতীয় জীবনের জমা খরচের খাতায় তাদের দেশে জমার ঘরে থাকে হাজার করা ১১ বেশি; আমাদের দেশে খরচের খাতায় হাজার করা প্রায় ১১ বেশি। এই হিসাবে বাংলা দেশটা শীঘ্রই দেউলে হ'য়ে যাবে। এই খরচের হিসাব খতিয়ে খরচের দফাগুলি বেশ ক'রে দেখা উচিত। প্রথম দফা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী। আমরা শিখেছি "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে মা বাপ আশা ক'রে থাকেন, ছেলে গাড়ী ঘোড়া চ'ড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবে। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, অম্বল, পেটের অসুখ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, চসমা-প্রাবল্য প্রভৃতি নানা ফাঁড়া কাটিয়ে কোন প্রকারে ছেলেটা বিশ্ববিদ্যালয়-সরস্বতীর পূজা সমাপ্ত ক'রে উকীল পদবী প্রাপ্ত হয়েছে। উকীলের জমার ঘর শূন্য, কিন্তু ইতিমধ্যে লোক সংখ্যার খাতায় জমার ঘর পূর্ণ হ'তে চলেছে। মুন্সেফীর রেজিষ্টারি পুস্তকে নাম লিখিয়ে অনেক কষ্টে একটা মুন্সেফী চাকুরীর জোগাড় হল। জমার চেয়ে খরচ বেশী; কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার প্রভাবে, শিক্ষালগুড়াহত দেহে জমার চেয়ে খরচের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। ("মুন্সেফ-রোগ" বা) ডায়েবিটিস্-জীর্ণ দেহ-তরণীটাকে ঠেলে মুন্সেফীর ক্ষুদ্রনালা থেকে সদরওয়ালার ভরা গঙ্গায় যখন এনে ফেলা হয়েছে, গঙ্গার তরঙ্গাঘাত ঐ জীর্ণ তরণী বেশী দিন সইতে পারলে না। এ ত গেল গরীব ধনীদের কথা। মাসে দুইশত টাকা যার আয় সেও এখন গরীব। কিন্তু দশটা পাঁচটায় কি সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খেটেও যাদের ভাত কাপড় জোটে না, তারা রোগের আক্রমণ সইতে না পেরে লাখে লাখে মরে। এই সমুদয় রোগের আক্রমণ নিবারণ করা যায়, তাই এদের বলে নিবার্য্য রোগ। বাংলায় বছর বছর দশলক্ষ লোক এই নিবার্য্য রোগে মারা যায়, এদের অর্দ্ধেকের বয়স দশ বছরের কম। চেষ্টার অভাবে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তেরশোয়ের বেশি শিশু মারা যায়।

নিবার্য্য রোগে মারা যায়—

প্রতিবৎসর	...	...	১০,০০,০০০ (মোট)
	...	...	৫,০০,০০০ ছোট ছেলে
প্রতিদিন	...	...	১৩৭০টী ছোট ছেলে

জন্মের এক বছরের ভিতর ৩,২৫,০০০টী শিশু মারা যায়। একথা শুনে তোমরা চমকে উঠ্‌ছ? কিন্তু পেটের ভিতর কত ছেলে মারা যায় জান? প্রায় চার লক্ষ। যে তের চৌদ্দ লাখ ছেলে বেঁচে থাকে, তাদের কজনই বা বড় হয়ে কাজে—প্রকৃত কাজে লাগে? প্রকৃত কাজ দশটা পাঁচটায় কলম পিষে মুনিবের ধমক খেয়ে বাড়ীতে গিয়ে নিরীহ স্ত্রীলোকদের উপর ঝাল মিটন নয়, কিম্বা তাস পাশার আড্ডায় গিয়ে দুঃখ ভুলে যাওয়া নয়, কিম্বা গাধার খাটুনী খেটে বাড়ী গিয়ে নেতিয়ে পড়া নয়, কিন্তু নিজের ও দেশের কাজে সতেজে অবিশ্রান্ত খাটা। এই অবিশ্রান্ত খাটার শক্তি কজনের? গত যুদ্ধের সময় যে সব বাঙ্গালী যুবক রংরুট হ'তে এসেছিল, তাদের শতকরা ৭৫ জনকে অনুপযুক্ত বলে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। কারণ কি?

উরূপা-মহাসমরে বিলাতে রংরুটের সময় দশ লক্ষ লোক অকর্ম্মণ্য গণ্য হয়েছিল। অকর্ম্মণ্যতার কারণ ডাক্তারদের মতে শিশুপালন জ্ঞানের অভাব। গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর স্ত্রীলোকদের প্রকৃত শুশ্রূষা হয় না, অসুস্থ স্ত্রীলোকদের সন্তান রোগে বা স্তন্যদুগ্ধাভাবে মারা যায়; যারা বাঁচে, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে থাকে। তাই বিলাতের লোকেরা গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে, প্রসবান্তে স্ত্রীলোকদের ঘরে ঘরে ধাত্রী ও ডাক্তার পাঠিয়ে চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও শিশুপালনের ব্যবস্থা করেছেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞলোকদের শিক্ষা ও রোগনিবারণের ব্যবস্থার জন্য সভা সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে। আমাদের জনসাধারণ এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট; আর সরকারী ব্যবস্থায় লাভের গুড় পিঁপড়েতেই খায়। সৈন্তবিভাগ প্রভৃতি মানুষমারা কল রক্ষার জন্য টাকা ঢেলে, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মন্ত্রীদের রুই কাতলার ব্যবস্থা ক'রে, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাই থেকে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় ক'রে সরকার দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা করেন। এই উপায়ে দেশে স্বাস্থ্য ফিরে আসতে পারে না। ফিরে আসতে পারে, যদি আমরা দশে মিলে তার ব্যবস্থা করি। অবশ্য পূর্ণ স্বরাজ না এলে পূর্ণ স্বাস্থ্য আসবেনা। কিন্তু স্বরাজ সরঞ্জাম তাড়িৎব্যজনের নিম্নে আরাম কেদারায় সুপ্ত নিদ্রালস স্বদেশানভিজ্ঞ কলিকাতা-বাবু নয়, কিন্তু দেশের প্রকৃত জীবন—গ্রামের শোভা, কৃষক ও শ্রমজীবী। স্বরাজের আশা সুদূর পরাহত ততক্ষণ যতক্ষণ না তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া বসন্ত ওলাওঠা হ'তে রক্ষা করা যায়, তাদের অন্নবস্ত্রাভাব ঘুচিয়ে রোগ আক্রমণ এড়াবার শক্তি দেওয়া যায়। রোগে শোকে সাহায্য ক'রে তাদের আপনার করে নিয়ে বুঝাতে হবে দেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞান, গোচারণ মাঠ, দুগ্ধবতী গাভী এবং দুগ্ধের অভাবে কত লাখ লাখ শিশু মারা যাচ্ছে, যারা বড় হয়ে পরিবারের ও দেশের কাজ করতে পারত। তাদের স্ত্রীলোকদের বুঝাতে হবে কেমন ক'রে মা পূতনারাক্ষসী হ'য়ে বিষাক্ত স্তন্যদুগ্ধ বা বিকৃত গোদুগ্ধ খাইয়ে নিজের শিশুকে গলা টিপে মেরে ফেলচে। পূতনারাক্ষসী বিষ মাখান স্তন্যপান করিয়ে শিশু কৃষ্ণকে মারতে গিয়েছিল, কিন্তু শক্তিশালী শিশু স্তন ধ'রে এমন বজ্রটান দিলে যে টানের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীর প্রাণ বেরিয়ে গেল। এই আখ্যায়িকার মর্ম্ম বুঝতে হ'লে আয়ুর্ব্বেদ আলোচনার প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় পূতনা এক প্রকার শিশুরোগের নাম। ইহার লক্ষণের সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়ার লক্ষণের অনেক

সাদৃশ্য। শিশুকৃষ্ণ এই রোগকে নাশ করেছিলেন কেমন ক'রে? এ কথাটা বুঝতে হ'লে Power of Resistance কথাটা বুঝতে হয়। এ কথার অর্থ রোগ আক্রমণ ব্যর্থ করবার শক্তি। এই শক্তি যার আছে তাকে কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ওলাওঠা-বিষ-কলুষিত জল অনেকে খায় কিন্তু যাদের ঐ শক্তি আছে তাদের ওলাওঠা হয় না। ম্যালেরিয়ার দেশে থেকেও কারো কারো ম্যালেরিয়া হয় না। কি রকম জান? যেমন গোলামখানা-খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও দেশ হিতৈষীদের গোলামী ভাবটা যায় না। এই রোগ তাড়াবার শক্তি শৈশব থেকে তাদেরই জাগে যারা যথেষ্ট পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পায়। স্তনে দুগ্ধ তাদেরই যথেষ্ট হয় যাদের আছে হরিততৃণাচ্ছাদিত গোচারণ মাঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী। মা যশোদার তা ছিল, তাই শিশু কৃষ্ণ পূতনা-আক্রমণ ব্যর্থ করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের বুঝাতে হবে খোলা মাঠের প্রয়োজনীয়তা, কলকারখানা প্রতিষ্ঠাতা সাহেবদের নিকট অর্থলোভে জমি বিলি করার অনিষ্টকারিতা, গোজাতির উন্নতি বিধান এবং বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষার অত্যাবশ্যকতা। তোমাদের চেষ্টায় যখন গ্রামবাসীর লুপ্তস্বাস্থ্য ফিরে আসবে, নানাবিধ রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করতে যখন তারা সমর্থ হবে, নানাবিধ রোগে তাদের শুশ্রূষা ক'রে যখন তাদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনবে, তখনই বুঝবে তোমরা তাহাদের প্রকৃত বন্ধু। তখন যা বলবে তাই তারা শুনবে। স্বরাজ আসবে প্রাণময় সরল বিশ্বাসী মুক্ত-প্রান্তর-বিহারী গ্রামবাসীর ডাকে, প্রাণহীন জমাখরচ-চিন্তা-ভারগ্রস্ত মোটরারোহী সহরবাসী বাবুবৃন্দের বিজ্ঞতাসূচক বাক্য বিন্যাসে নহে। গ্রামে গিয়ে তাদের আত্ম নির্ভর ও চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তুলবে। 'আমাদের যা ছিল ও যা আছে তাই ভাল' এই কাল্পনিক সন্তোষ-মায়া-জালটী ছিঁড়ে দিতে হবে। অনেকগুলি মেয়েলি ব্যবস্থা মুনি ঋষির ব্যবস্থার মতন অলঙ্ঘ্য হ'য়ে পড়েছে, সেই গুলি যে প্রকৃত শাস্ত্র নয় তা বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝাতে হবে ওলাউঠা একটা দানব দৈত্য নয়, যে মন্ত্র-পূত কাগজ বা পতাকা দেখে তারা পালিয়ে যাবে, কিম্বা ভয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, কিন্তু এর কারণ কতকগুলি বীজাণু মাত্র। ভয় কি? এদের মৃত্যুবাণ ত প্রত্যেকের হাতেই আছে।* কেবল দশে মিলে ব্যবস্থা করলেই হয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে পড়ে কেবল অদৃষ্ট বেচারীকে গালিমন্দ দিবার প্রয়োজন নাই। চেষ্টায় ম্যালেরিয়াও দূরীভূত হয়। ফরাসীশ অধিকারে এল্‌জিরিয়া নামক একটী দেশ আছে। তার মধ্যে মিটিজ্জা উপত্যকার নাম ছিল "ফরাসীশ কবর" (Frenchman's grave)। সেখানে গেলেই ফরাসীশ মাত্রেরই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু অবধারিত ছিল। দশের চেষ্টায় সে স্থানের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন সেখানটাকে বলে মরকত মিটিজ্জা। (Emerald Mitidja)। জমির আবাদ ক'রে, কমলা নেবু আঙ্গুর প্রভৃতির চাস করে সে স্থান এখন নন্দন কাননে পরিণত হয়েছে।

অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ শিশু নষ্ট করবার জন্য যখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, ভীতা উত্তরা করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলেছিলেন :—

---

* মুসলমানদের গোর দেওয়া এবং গোরস্থানে সদলে লইয়া যাওয়া ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সেদিন ময়মনসিংহে এক গ্রামে ওলাউঠায় ভয়ে সকলে পলাইয়া গেল এবং একজন মুসলমান মৃত স্ত্রী পুত্রকে গোর দিবার লোক না পাইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নিজে ও সকলে পুড়িয়া মরিল। লেখক।

পাহি পাহি মহাযোগিন্। দেব দেব জগৎপতে।
অভিদ্রবতি মামাশ। শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ। মামে গর্ভো নিপাততাৎ॥

আজ লক্ষ লক্ষ শিশুর মাতা করযোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলচেন:—

"রক্ষা কর রক্ষা কর। আমাদিগকে রোগ মৃত্যু আক্রমণ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের সন্তান যেন মারা না যায়।"

ভগবান তাদের কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। তাই তিনি গোপালরূপে তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে শিশু ও শিশুর জনক জননীকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তোমরা আপনার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর এবং শিশুর মধ্যে জাতীয় জীবনের মূল বীজ নিহিত জেনে শিশু ও তাহার পিতা মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হও।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

শান্তি।

গণ্ডে ঝঞ্ঝা এলো চুলে,
দৃষ্টি উজ্জ্বল বিদ্যুতে,
অট্ট হাস্যে ওষ্ঠ মূলে
দীপ্তি গোঁয়ায় মৃত্যুতে।
মুষ্টিবদ্ধ লিপ্ত খড়্গ
রক্ত ধারে চর্চ্চিত,
বিকট নাদে ফাটে স্বর্গ
বিশ্বে প্রলয় তর্জ্জিত।
দৃপ্ত হিংসা, সুরার ঝাঁঝে
নগ্ন অঙ্গ মর্দ্দিছে,
রুধির তৃষায় পিশাচ নাচে
বিশ্বে প্রলয় বর্দ্ধিছে।
কর্ম্মে অটল বিশ্ব-শান্তি
তুচ্ছ করে স্পর্দ্ধিতে,
সদা-শিবের শুভ্র কান্তি
পারবে কেবা মর্দ্দিতে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বরাজ।

(১১)

এখন মনে করা যাউক যে এই গৌরবর্ণ সাম্রাজ্যবাদী জাতি বা নেশনের অন্তর্ভুক্ত শাসক-সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্নভাষী, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, গৌর, শ্যাম, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ লোকগুলির প্রতি রাষ্ট্রের যে সকল কর্ত্তব্য তাহা সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম। মনে করা যাউক যে তাহাদের সর্ব্বদেশে প্রসারিত বাণিজ্যের স্বার্থ, তাহাদের পরিপুষ্ট ও পুষ্টপ্রার্থী শ্রমশিল্পের স্বার্থ, তাহাদের অর্দ্ধশিক্ষিত অভিজাতদিগের স্বার্থ, তাহাদের সুশিক্ষিত শাসনক্ষমতাভিমানী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের স্বার্থ, তাহাদের তেজোবান্ শ্রমজীবিদের স্বার্থ, তাহাদের জাতীয়তাভিমান দুষ্ট মহিলা ধর্ম্মযাজক বা সুপণ্ডিতদিগের স্বার্থ, তাহাদের গর্ব্বিত জল-স্থল শূন্য-বিহারী সেনাদিগের স্বার্থ—এককথায় তাহাদের সমগ্র জাতি বা নেশানের স্বার্থ ভারতবর্ষের ভূমি বা খনি, শ্রম বা অর্থদ্বারা পরিপুষ্ট করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এই শাসকসম্প্রদায় সংযত করিল। মনে করা যাউক যে সুদূর বৃটেনে তাহাদের যে রাষ্ট্র, তাহার আত্মরক্ষা ও পোষণের ব্যাপারে এই শাসক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বার্থের হানি হইতে দিবে না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ও সেই প্রতিজ্ঞা কার্য্যতঃ পালন করিতে তাহারা ও তাহাদের ভারতীয় প্রতিভূগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। এসব যদি সত্য হয়, তাহা হইলেই কি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গঠনোন্মুখ জাতগুলি দেশের লোকের সকল রাষ্ট্রীয় কার্য্যের পরিচালনার ভার সেই শাসক-সম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে প্রস্তুত?

প্রশ্নটির উত্তর দিবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। পানীয়, অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ, ঔষধ প্রভৃতি মানুষের দেহরক্ষার জন্য যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন তাহার উৎপাদন দেশমধ্যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহার প্রাপ্তির সুবিধা—এই দুই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের কি আন্দাজ প্রভাব তাহার কিছুটা আভাস পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি না হইলে দেহরক্ষা হয় না, অতি বড় ধাম্মিকেরও নয়। মানুষের দৈনিক জীবনের প্রথম ও প্রধান অধ্যায় এইগুলি লইয়া, সুতরাং এইগুলির সম্পর্কে রাষ্ট্রের যে প্রভাব তাহা উপেক্ষা করা চলে না। এগুলির কার কতটা প্রয়োজন তাহা অনেকটা মানুষের নিজের মনের উপর নির্ভর করে। একটা মাত্রা আছে যাহার নীচে আর অভাব কমান যায় না। কিন্তু মাত্রাটা অনেক পরিমাণে নিজের আয়ত্তাধীন। যে নিজের অভাব ও প্রয়োজন যথাসাধ্য স্বল্প করিয়াছে, নিজের মনের বাসনা সংযত করিয়াছে, তাহার জীবনে রাষ্ট্রের শুভ বা অশুভ প্রভাবে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। তার পরে যদি সে রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের ন্যায় সতত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে আত্মায় পরমাত্মায় যোগসাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহার বেলায় রাষ্ট্র নাই বলিলেও হয়। তাহার কাছে সুরাষ্ট্র বা কুরাষ্ট্র নাই, স্বরাজ বা পর-রাজ নাই। আমাদের দেশে তেত্রিশকোটি রামকৃষ্ণপরমহংস বাস করিলে স্বরাজের আলোচনারই প্রয়োজন থাকিত না। আমাদের দেশে তেত্রিশকোটী লোক আমার ন্যায় সাধারণ মানুষ, রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের ন্যায় তাহারা এত সংযমী, আত্মস্থ ও যোগ-যুক্ত নহে। তাহাদের ধর্ম্ম বলিতে সচরাচর ধর্ম্মের বাহিরের অনুষ্ঠান বুঝায়। তাহাদের ধর্ম্মের

মাত্রা. প্রথমতঃ তাহাদের স্বাভাবিক সুখস্পৃহা ও দ্বিতীয়তঃ তাহাদের পরিবারের অপর লোকের অভাব প্রধানতঃ এই দুইটী দ্বারা নিয়মিত হয়। তাহারা কামিনী কাঞ্চন সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে চাহে না। সুতরাং অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতির আয়োজন হইলে, তাহাদের দৈনিক জীবন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, পতি পত্নীর সম্বন্ধ, আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধ, প্রতিবেশী বন্ধুর সম্বন্ধ প্রভৃতি লইয়া ব্যাপৃত থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতকর্ম্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান ও অপর ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া তাহারা ব্যস্ত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহারা তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন লইয়া বার মাস ত্রিশ দিন ব্যস্ত। আমাদের দেশে বৃটিশরাষ্ট্র মানুষের এই দৈনিক জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করিতে চায় নাই। এই সব পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যে টুকু আধিপত্য করিয়াছে তাহা প্রায়ই দেশের লোকের আদর্শ ও স্বাধীন ইচ্ছার অনুযায়ী। কোনও কোনও স্থলে প্রথমতঃ কিছুটা দেশের লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও, পরে তাহা দেশের লোক অনুমোদন করিয়াছে, যথা—সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, চড়কে পিঠ বিঁধাইয়া ঘোরা ইত্যাদি প্রথা নিবারণ। আরও কতকগুলি ব্যাপার—যথা—দত্তকগ্রহণ, দায়াধিকার, প্রজা-ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ, বিবাহবিধি—বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল পরেও তাহাই রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে হাত দেয় না বলিয়াই কি আমরা রাষ্ট্রীয় কার্য্যের পরিচালনার ভার ঐ শাসক-সম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত?

প্রত্যক্ষভাবে দেশের লোকের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপর রাষ্ট্র আধিপত্য না করিলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের প্রভাব তাহার উপর আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। সে প্রভাব পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সুস্থ, সবল, সতেজ উদার আনন্দপূর্ণ ও পূর্ণতাপ্রয়াসী করিতে পারে। আবার সে প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ, স্বল্পে তুষ্ট, একঘেয়ে স্ফূর্ত্তিহীন ও ম্লানও হইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে রাষ্ট্র সুস্থ সতেজ, উদার, আনন্দপূর্ণ ও পূর্ণতাপ্রয়াসী করে নাই, ইহা নিশ্চিত। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাধুর্য্য আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি গুণে তাহা মধুর। তাহাতে ধর্ম্মভাব, আত্মবিসর্জ্জন, পরসেবা প্রভৃতি বৃত্তির চরিতার্থতা সম্ভব। কিন্তু তাহার প্রসার অতি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। উদারতা ও বিশালতা তাহার লক্ষণ নহে, বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে তাহার দৃষ্টিই নাই। আর এই যে মধুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কথা বলিলাম, তাহা সঙ্কীর্ণই হউক আর বিশালতা ও পূর্ণতাপ্রয়াসী না-ই হউক, সেই সঙ্কীর্ণ অথচ মধুর, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই বা দেশের কতজন লোকের মধ্যে সম্ভব। শুধু জীবন রক্ষার জন্য জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন, তার উপর একটু কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে না থাকিলে এই মাধুর্য্যের বিকাশ সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের সমগ্র জনসংখ্যার কয়জন লোকের সেই সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ আছে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আর যাহাদের বা সেই সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ আছে তাহারাও অনেকেই অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। সত্যই "আমরা অন্ন হইয়া থাকি"। নিজ নিজ জীবন

আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে ভারতের বাহিরের সভ্যসমাজের তুলনায় আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা বা ইতিহাসাদি আলোচনার রস আসিয়া তাহাকে নূতন পূর্ণতর মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যাও, যদিবা কিছু এই নূতন রস পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ রসে বঞ্চিত বলিলেও চলে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের বাহিরে জাতীয় আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের বাহিরে সামান্য জনকয়েক লোক বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী শিল্পকলার সাহায্যে মধুর অভাব গুড় দিয়া মোচন করিতেছেন। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের কথা বলিবার সময়ও আবার বলি, সমগ্র জনসংখ্যার কতটুকু অংশ এই নূতন রসাস্বাদন করিয়া স্বীয় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতেছে? কিন্তু এই সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশের সহায়তা পুরাকালে রাজার ও রাজসভার কর্ত্তব্য ছিল। এখনও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া সে বিকাশ সহজ হয় না। পরোক্ষভাবে দেশের লোকের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যদি রাষ্ট্রদ্বারা প্রভাবিত হয় ও সে প্রভাব যদি তাহাকে দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণ ও ম্লান করিতে পারে, তবুও কি আমরা রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার ঐ বিদেশীয় জাতির শাসকসম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত?

বিদেশীয় বিজাতীয় শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষে তাহাদের আপন দেশের ও জাতির স্বার্থ ভারতের অর্থে পরিপুষ্ট করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা ও সে প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য সরল মনে চেষ্টা করা বরং সহজ। সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইলে ভারতের লোকের পানীয়, অন্নবস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি দেহ রক্ষার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া বরং সহজ হইতে পারে। কিন্তু এই যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিশালতা ও পূর্ণতার কথা বলিলাম, এ ব্যাপারে যদি রাষ্ট্র আসিয়া দেশের লোকের সাহায্য করিতে চায় তবে সে রাষ্ট্রের কর্ণধার বিদেশীয় বিজাতীয় কোনও সম্প্রদায় হইলে চলিতে পারে না। এ ব্যাপারে স্বরাজ না হইলে রাষ্ট্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে উদারতা ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না।

কোনও দেশের অধিকাংশ লোকে যদি সদৃশ ভাষা সাহিত্য, ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও চালচলনে এক হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠে, তখন ন্যায়তঃ সে জাতি বা "নেশান" সে দেশে স্বীয় হস্তে স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার ভার চাহিতে পারে—ইহাই জাতীয়তাবাদের (Nationalism) মূল কথা। এ কথাটী মনে রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পূর্ণতা সাধনের দিকে নজর পড়িলেই, অমনি জাতিগঠন বা রাষ্ট্রগঠন ব্যাপার সহজ হইয়া পড়ে, এমন নয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণতা সাধন ও সামাজিক জীবনের পূর্ণতা সাধন এক কথা, এরূপ বলা যায় না। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন ইহার প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন অথচ পরস্পর সুসংবদ্ধ। একটীর সহিত অপরটীর অতি নিকট সম্পর্ক। এত নিকট সম্পর্ক যে একটীর বিকাশে বাধা পাইলে অপরের স্বাভাবিক ও পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন—এ সকলের উপর

ধর্ম্মসমাজের (church) ও রাষ্ট্রের (state) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রবল। কিন্তু এ সকল প্রকার জীবনের ভিত্তি দেহরক্ষা। মানবদেহ মূলভিত্তি, তাহার উপর মানব মন ও মানব আত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশে ও ভিন্ন নূতন নূতন মানবসঙ্ঘের সাহায্যে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসঙ্ঘ-সংক্রান্ত জীবন গাঁথিয়া তুলিতে হয়। জীবন গঠনের এই ক্রমোন্নতি ও পূর্ণতা প্রয়াসী মানবসঙ্ঘগুলির শত বৈচিত্র্যের মূলে মানবদেহ। আর পরিবার, সমাজ, ধর্ম্মসঙ্ঘ বা রাষ্ট্র—এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টির মধ্যে রাষ্ট্রই হইতেছে সেই বিপুল শক্তিশালী সমষ্টি, যাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ঐ মানব দেহ রক্ষা। তাহা যদি হয়, তবে কি আমাদের দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার—এই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মূলভিত্তি যে মানবদেহ রক্ষা, তাহার শুভাশুভের ভার ঐ বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসক-সম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমরা প্রস্তুত?

অপরে আমাকে লালন পালন করিবে আর আমি নিরুদ্বেগে জীবন ধারণ করিব ইহাতে এক রকম শান্তি থাকিতে পারে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নিজের বৃত্তিগুলির সম্যক্ বিকাশের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিলে, ইহাতে সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। আজ প্রায় ১৬ বৎসর হইল লণ্ডনে মিড্‌ল্ টেম্পল (Middle Temple Hall) ভোজনশালায় একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রায় আড়াই শত লোক একত্র আহারে বসিয়াছিলাম। আমাদের মেজে আমরা চারিজন ছিলাম। তাহার একজন লণ্ডন প্রবাসী স্কচ জাতীয় প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার, আর একজনও ব্যারিষ্টার, আইরিশ জাতীয়। তাঁহারা দুইজনে বন্ধু। কেহই ভারতবর্ষ দেখেন নাই। স্কচ ভদ্রলোকটী ভারতবর্ষের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার কারণ কি? *লোকটী কি এমনই অত্যাচারী যে বাঙ্গালীদের কাছে এতটা অপ্রিয় হইয়া* উঠিয়াছে। দুই দুইবার তাহাকে মারিবার চেষ্টা হইল। ফ্রেজার সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে অপর ব্যারিষ্টরটী, যাহার দেশ আয়র্ল্যাণ্ডে, তিনি হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফ্রেজার সাহেবের বাড়ী কোন্ দেশে। আমি বলিলাম, স্কটল্যাণ্ডে। তিনি হাসি চাপিয়া, রাগের ভাব দেখাইয়া উত্তর দিলেন—"ঐ ত যথেষ্ট কারণ!" (Reason enough!) হাসির রোল পড়িয়া গেল। তাহার পরে আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এবার ঐ স্কচ ভদ্রলোকটী আফ্রিকার ও অপরাপর বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি অবমাননার কথা তুলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এরূপ ব্যবহার যে অন্যায় তাহা কি আবার বলিবার প্রয়োজন আছে? কিন্তু এ ব্যাপারেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। তোমরা ভারতবাসীগণ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা কর। দেখিবে, বৃটিশ সাম্রাজ্য তাহাতে বাধা ত দিবেই না, পারিলেই সাহায্য করিবে। এত বড় অন্যায় এই ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলি যে করিতে পারে, তাহাতেই প্রমাণ যে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির সাম্রাজ্যের ভিতরে কতটা স্বাধীনতা। আমার স্বাধীনতার অর্থই এই যে ভাল বা মন্দ দুইই আমি করিতে পারি, নতুবা স্বাধীনতার অর্থ থাকে না। তোমরা ভারতবাসীরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী। তোমরাও এই অন্যায়ের প্রতিকার-চেষ্টা কর।" নিজের

সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উন্নতি কর। দেখিবে যে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে যত স্বাধীনতা, এত স্বাধীনতা কোনও রাষ্ট্রে নাই। সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেও দেখিবে যে সে রাষ্ট্রের নিজ নিজ জীবনে এত স্বাধীনতা পাইবে না। অথচ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিলে, বাহিরের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইতেছ। মিছামিছি তোমরা 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়' বলিতেছ। সাম্রাজ্যের বাহিরে গেলে, শুধু তোমাদের কেন, সাম্রাজ্যের যে কোনও অংশের অবস্থা কেমন হইবে জান? যেন তীরে ভূতের উৎপাত এড়াইতে গিয়া অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া (Between the devil and the deep sea)।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হতে পারে। কিন্তু আমার দেশবাসীর মনের ভাব কি জান? ভূতের সঙ্গে ত ঘর করিয়া দেখা গেল, কি উৎপাত। এখন অগাধ সমুদ্রটা কি রকম, একবার দেখা যাক্। বয়োপ্রাপ্তির এই লক্ষণ।"

(১৩)

বস্তুতঃ কথাও এই। নিজের দেশে নিজের রাষ্ট্র নিজেরা চালাইব, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা। বয়স হইলে যখন কোনও জাতির বৃত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তখন এ ইচ্ছা আপনা আপনি জাগে। মানব সভ্যতার আলোচনা করিতে গিয়া জ্ঞানী এরিষ্টটল এই জন্যই বলিয়াছেন যে মানুষ রাষ্ট্রীয় জীব (Political animal)। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্বেল্ ব্যানারম্যান্ (Sir Henry Campbell-Bannerman) বলিয়াছিলেন যে সুরাজ দিয়া স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করা অসম্ভব (Good governmeent can never be a substitute for self-government)। আর যখন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির অগাধ জলে সাঁতার খেলিতে খেলিতে ভারত সচিব মর্লী বা ভারত সচিব মণ্টেগু মাঝে মাঝে বলিয়াছেন যে এ দেশের রাষ্ট্রশাসন যন্ত্র যদি শুধু ভারতবাসীরই হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ইংরাজকে যদি তাহার চালক না রাখা হয়, তবে সে যন্ত্রের কার্য্যকারিতা (Efficiency) হ্রাস পাইবে ও তাহার ফলে নিকৃষ্ট শাসনে ভারতের জনগণের সমূহ ক্ষতি হইবে,—তখন এই সত্যেরই উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিয়াছি যে, মানিয়া নিলাম যে বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী শাসনযন্ত্র চালাইতে এখন আর তেমন কর্ম্মকুশল নহে, মানিয়া নিলাম যে, ইংরাজ নিজের দেশে তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও, আমাদের দেশের শাসন যন্ত্র চালাইতে সুনিপুণ, তবুও আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক যখন সুশাসন পাইতে যত ব্যগ্র, তার চেয়ে বেশী ব্যগ্র স্বয়ং শাসন চালাইতে, তখন তাহাদের স্বরাজের সাধ কিছুতেই সুরাজে মিটিতে পারে না। ইংরাজের কর্ম্মকুশলতা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ধার করা কর্ম্মকুশলতায় আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকশিত হইতেছে না। তাহারা নিজের কর্ম্মকুশলতা (Efficiency) চায়, পরের ধার করা কর্ম্মকুশলতায় তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। সে তৃপ্তির জন্য যদি দেশের শাসন কার্য্য কতকাংশে নিকৃষ্ট হয়, হউক। সুশাসন না-ই হইল। একেবারে দুঃশাসন ত হইবে না। এ কথারও মূলে সেই এক সত্য। ভারতবাসীও মানুষ, ভারতবাসীও

রাষ্ট্রীয় জীব। ইচ্ছা যখন জাগিয়াছে, তখন তাহার রাষ্ট্রীয় বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের জন্ত স্বাধীনতার নির্ম্মল আলোক, বিশুদ্ধ বাতাস ও উন্মুক্ত আকাশ চাই।

এতদিন আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের কোনই সুযোগ ছিল না, এ কথাও সত্য নহে; আর আজ প্রায় এক বৎসর হইল রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ মিলিয়াছে বা নিজের প্রশস্ত সুগম পথে আমরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এ কথাও সত্য নহে। কথাটার সমাক আলোচনা এখানে হইতে পারে না। মোটামুটি কয়েকটা কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে আমরা ভারতসচিব মণ্টেগুমহাশয়কে বলিয়াছিলাম। যুদ্ধের সময়ই হউক বা শান্তির সময়ই হউক, শান্ত বিভাগের (civil) কর্ম্মই হউক বা সমর বিভাগের (military) কর্ম্মই হউক, রাষ্ট্রীয় সকল কর্ম্মগুলিকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী, শাসন-নীতি নির্দ্দেশ (Determination of Policy), আর সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ করা (Execution of the Policy)। আর এ দুইয়ের মাঝামাঝি এক শ্রেণী, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ হইতেছে কি না, তাহার পরিদর্শন (Supervision of Execution)। প্রথম শ্রেণীর বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। দ্বিতীয় শ্রেণী, পরিদর্শন ও তৃতীয় শ্রেণী, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ —এই দুইটা বুঝিতে, তাহা হইলে আর বেগ পাইতে হইবে না। শাসন বা পোষণ কার্য্য কোন্ নীতি অনুসারে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা রাষ্ট্রের একটা বড় কাজ। আর এই নীতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রধানতঃ তিনটী বিষয় স্থির করা দরকার:—(১) অধিকার (Rights) ও দায়িত্ব (Duties) স্থির করিতে হইবে; (২) অধিকার (Rights) যদি রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের বাহিরের লোকেরা না মানে, স্বীয় দায়িত্ব বহন করিতে যদি তাহারা আপত্তি করে বা বাধা জন্মায়, তবে প্রয়োজন মত শাস্তি নির্দ্দেশ করিতে হইবে ও (৩) কোন্ কার্য্য বিধি (Procedure) অনুসরণ করিয়া অধিকার মনোনীত হইবে, বা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করাইতে হইবে বা প্রয়োজন হইলে শাস্তি দিতে হইবে সেই কার্য্যবিধিও Procedure) নির্দ্দেশ করিতে হইবে যেন অযথা অত্যাচার বা উৎপীড়ন না হয়। আর এই যে অধিকার (Rights) বা দায়িত্ব (Duties) নির্দ্দেশের কথা বলিলাম, তাহা যে কি বিশাল ও জটিল ব্যাপার তাহা দুই চারি কথায় এখানে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বেও তাহার আভাস দিয়াছি, আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই হইবে—যথা, এক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার জনগণের প্রত্যেকের প্রাণ সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ও সেই সম্পর্কে এই সকল অধিকারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপর দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রত্যেকের আত্মরক্ষার অধিকার ও এই সকল পররাষ্ট্রের জনগণের প্রাণ সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Foreign Policy); আমাদের রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যেকের প্রাণরক্ষার ও দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার ও তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার; আমাদের রাষ্ট্রের ব্যয় চালাইবার জন্য তাঁহার জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ সাহায্য করিবার দায়িত্ব; অসহায় শিশু সন্তানের প্রাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রের ও পিতামাতার দায়িত্ব; আমাদের রাষ্ট্রের বালক বালিকাগণের প্রত্যেকের দেহ, মনোবৃত্তি ও

চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাযোগ্য শিক্ষা পাইবার অধিকার ও সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও পিতামাতার দায়িত্ব; সংক্রামক রোগ বিস্তার নিবারণ করিতে রাষ্ট্রের ও জনগণের দায়িত্ব, দরিদ্র প্রতিপত্তিহীন শ্রমজীবিগণের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিপত্তিশালী ও ধনী শ্রম-নিয়োক্তাগণের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব, শ্রমজীবিগণের সমবেত ও দলবদ্ধ হইয়া একযোগে স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য নিরুপদ্রব প্রয়াসের অধিকার; ধনী শ্রমনিয়োক্তাগণের কারখানা ও তথাকার যন্ত্রাদি বিনাশ নিবারণ করিবার অধিকার, সচ্চরিত্র শিক্ষিত কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও স্ত্রীর সদুপায়ে শ্রমদ্বারা জীবনরক্ষার উপযোগী অর্থ পাইবার অধিকার ও সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের দায়িত্ব, সমাজ যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছে তাহাদের মানবোচিত সম্মানের ও সাম্যের অধিকার, শান্তিরক্ষক পুলিস ও সৈন্যের অধিকার; জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বাক্যের অধিকার, স্বদেশী বা বিদেশী জাহাজে আনীত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করিবার অধিকার; প্রজা ও ভূম্যধিকারীর অধিকার, ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকার, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের অধিকার, ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন যে, এই ছোট তালিকাটা শুধু কল্পনার সৃষ্টি। কেহ হয় ত বলিবেন, অধমর্ণের আবার অধিকার কি? টাকা যে ধারে তাহারও যে অধিকার থাকিতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আমাদের এই আর্য্যাবর্ত্তে এমন সময় ছিল, যখন ঋণী ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে বিচারপতির আদেশে ঋণদাতার সেবক ভৃত্য হইয়া বৎসরের পর বৎসর নফরি (Serfdom) করিতে বাধ্য হইত। আজ তাহা আইন-বিরুদ্ধ। আজ ঋণদাতা ছয় মাসের বেশী কাল ঋণীকে কারাবদ্ধ করিতে পারে না, আর এই ছয় মাসের মধ্যেও ঋণী ইচ্ছা করিলে দেউলিয়া আইনের বিধান মত অসমর্থ ঋণীর অধিকারের বলে কারাবাস ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব হইবে মুক্তিলাভ করিয়া সংসারে পুনরায় স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে পারে। ইতিহাসে এমনও দেখা গিয়াছে যে ঋণগ্রস্থ লোকদিগের এই অধিকার ছিল না বলিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের এই যে তিন শ্রেণীর কাজের কথা বলিলাম—শাসন নীতি নির্দ্দেশ, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ, ও সেই কার্য্য পরিদর্শন—এই তিন শ্রেণীর কাজ করিয়া মানুষের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকশিত করিতে হয়। কোনও মনোবৃত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতা মাত্র থাকিলে সেই বৃত্তি বিকাশের সুযোগ হয় না। সেই চিন্তা অনুযায়ী কাজ করিবার উৎসাহ ও উদ্যমের সুযোগও চাই। তবে সে বৃত্তি বিকাশের অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয়। এখন কেহ কি বলিতে চান যে আমাদের দেশে এই তিন শ্রেণীর কাজ করিয়া মানুষের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের কোনও সুযোগই কাহারও এত দিন ছিল না? সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর কাজ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট শাসন নীতি কার্য্যে পরিণত করা—ইহা প্রায় ষোল আনা আমাদের স্বদেশীয় লোকেরাই করিয়াছে। সকল দেশেই এই শ্রেণীর কাজের পারিশ্রমিক দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজে যত লোক দরকার হয়, এই শ্রেণীর কাজে তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক দরকার হয়। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট শাসন-নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সব লোক যদি সুদূর বিদেশ হইতে আনিতে হইত, তবে এ দরিদ্রদেশ-শাসন জন্য অসম্ভব ব্যয় হইত শুধু শাসনযন্ত্রের

ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াই রাষ্ট্র দেউলিয়া হইয়া পড়িত। এই কারণেও বিদেশ হইতে অল্প ব্যয়ে এত লোক আনা সম্ভব হয় নাই বলিয়া ও নির্দ্দিষ্ট শাসন নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী প্রচুর লোক অল্প পারিশ্রমিকে এদেশেই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এই সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর কাজ প্রায় ষোল আনা আমাদের স্বদেশীয়দের হাতে রহিয়াছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ, পরিদর্শন, ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশীয়দের হাতে আসিতেছে। ইতিমধ্যেই অনেকস্থলে পরিদর্শন কাজ আমাদের স্বদেশীয়দের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের স্বদেশীয় লোকের এ বিষয়ে কৃতিত্ব সকলেই স্বীকার করিতেছে। আর এই প্রথম শ্রেণীর কাজ সম্বন্ধে যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, শাসন-নীতি যাহারা কিছুই বোঝে না, তাহাদের পক্ষে শাসন-নীতি অনুযায়ী কাজের পরিদর্শনে কৃতিত্ব দেখান অসম্ভব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজের মধ্যে ব্যবধান যদিও কম, তবুও প্রথম শ্রেণীর কাজ, শাসন-নীতি নির্দ্দেশ, এত কাল আমাদের স্বদেশীয় লোকের হাতে ছিল না। বলিতে গেলে, সর্ব্ব প্রথম লর্ড মর্লী জন কয়েক ভারতবাসীকে এই কাজ করিবার কিছুটা সুযোগ দিয়াছেন। মন্ত্রীসভায় (Executive Council) ভারতবাসী স্থান পাইবার পূর্ব্বেও ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) ভারতবাসী স্থান পাইয়াছিল ও শাসন নীতি নির্দ্দেশ ব্যাপারে আমাদের স্বদেশীয় ব্যবস্থাপকগণ কতকগুলি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু শাসন কর্ত্তা (Governor) ও তাঁহার মন্ত্রীসভা (Executive Council) সে মতামত মানিতে বাধ্য ছিলেন না। তখন শাসন-নীতি ভারতবাসী ব্যবস্থাপকগণের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হওয়া বা না হওয়া শাসন-কর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভার উপর নির্ভর করিত। ব্যবস্থাপকগণের মত অবশ্যপালনীয় ছিল না। শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভার উপর ব্যবস্থাপকগণ স্বীয় মতামত প্রকাশ দ্বারা প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইতেন মাত্র। শাসননীতি নির্দ্দেশ ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপক সভার হাতে ছিল না। তাহা ছিল, বস্তুতঃ শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভার হাতে। ব্যবস্থাপকসভা শাসন-নীতি নির্দ্দেশের পূর্ব্বে বা পরে তাহার সমালোচনা করিতেও এই সমালোচনা দ্বারা যতটা সম্ভব শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভাকে প্রভাবিত করিতে পারিতেন মাত্র। আমাদের স্বদেশীয়গণ ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সভ্য হইয়া শাসননীতি নির্দ্দেশ করিতেন না। যে দুই চারি জন স্বদেশীয় লোক ভারতীয় মন্ত্রীসভার বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সভ্য হইতেন, শুধু তাঁহারা অপর মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তার সহিত একযোগে ও ব্যবস্থাপকগণের সমালোচনার সাহায্যে, শাসন-নীতি নির্দ্দেশ করিতেন। লর্ড মর্লী প্রবর্ত্তিত শাসন পদ্ধতিতে আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের তেমন সুযোগ হইয়াছিল এরূপ বলা যায় না। এই জন্য আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় গোলদিঘির পাড়ে এক প্রকাশ্য সভায় প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিয়াছিলাম যে, সেই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে বা অপর কোনও যোগ্য ভারতবাসীকে ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা (Governor General) নিযুক্ত করা হইলে ও আমাকে ও আমার পরিচিত স্বদেশীয় বিভিন্ন প্রদেশের বন্ধু বান্ধবকে শাসনকর্ত্তা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইলেই ভারতে স্বয়ং-শাসন (Self-Government) প্রতিষ্ঠিত করা হইল এরূপ মনে করিব না। তাহাতে ভারতের জনগণের রাষ্ট্রীয়

বৃত্তি বিকাশের উপযোগী আলোক বাতাস ও আকাশ পাওয়া হইবে না। শুধু যে আমার মত জন কয়েক লোকের মনে রাষ্ট্রীয় তৃষ্ণা আছে, অপর কোটী কোটী স্বদেশবাসীগণের মনে তাহা জাগে নাই বা জাগিবে না, ইহা যদি বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে স্বদেশবাসী শাসনকর্ত্তা হইতেছে, স্বদেশবাসী মন্ত্রী হইতেছে, স্বদেশবাসী ইংলণ্ডে ভারত সচিবের মন্ত্রণাসভার সদস্য হইতেছে, কালে স্বদেশবাসী প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবে বা ভারতসচিব হইবে ইহা মনে রাখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম। যেমন ভারতের প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার কথা বলিবার সময় বলিয়াছি যে, সে অতুল সাহিত্য ও শিল্প সম্পদের সে বিশ্ব-পূজ্য সভ্যতার রচনায় বা ভোগে আর্য্য ও অনার্য্য জনসাধারণের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, যেমন ভারতের মুসলমান সভ্যতার কথা বলিবার সময় বলিয়াছি যে, সে সভ্যতা সকল সমবিশ্বাসী মুসলমানের সমান অধিকার প্রচার করিলেও, সম্ভোগের সময় নিম্নশ্রেণীর অসংখ্য মুসলমান ও প্রায় সকল শ্রেণীর অসংখ্য হিন্দু জনসাধারণ বঞ্চিত হইয়াছিল, তেমনই কি সুদূর ভবিষ্যতে যখন আধুনিক ভারতের ইতিহাস লেখা হইবে তখন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা স্বার্থান্ধ হইয়া ভারত-জননীর ললাটের সেই প্রাচীন কলঙ্করেখা চিরমুদ্রিত রাখিবার জন্যই সারাজীবন প্রয়াস করিয়াছি? নিজেদের জনকয়েকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের আয়োজনে সন্তুষ্ট হইয়, কোটী কোটী স্বদেশীয়দিগের মানবোচিত অধিকারের কথা বিস্মৃত হইয়া, সুখে ধন যশ ও সম্মান ভোগ করিয়া দিন কাটাইয়াছি?

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

পোলাও—নবম উচ্ছ্বাস।

এই বুঝি শেষ হাড়ি, এই বুঝি শেষ,
বার্দ্ধক্য আময় জরা দেহ শক্তিহীন;
গৃহে অগ্নি জ্বলিয়াছে কগ্না গৃহিণীর
মরণের আবাহন হা হুতাশ ধ্বনি
ছিনায়ে লয়েছে মোর কবিতার স্পৃহা।
অনুজেরা নহে কেহ লক্ষণ অনুজ,
পিতৃ তিরোধান সহ, গুরুভক্তি টুকু
জাহ্নবীরে এসেছেন কবি উহা দান।
কি কাঠিন্য হেরি এবে মুখে তাহাদের,
দূরে থাকি তবু শুনি ভীম আস্ফালন,
বৃদ্ধ আমি, গৃহ ত্যাগী, সৈকত নিবাসী,
পিতৃধন ক্রান্তি মাত্র করিনি গ্রহণ,
তবু রোষকষায়িত অব্যক্ত রাগেতে
শুনি সদা ঘূর্ণ্যমান নয়ন তাদের।

আজি বিশ্ব চাহিতেছে সম বেদনায়
স্বমার্জ্জিত টলষ্টয়—উদাও গান্ধীজী;
আত্মজয়ী, বলিছেন, দেব ধ্বনি করি
দ্বেষ হিংসা পুড়াইয়ে, ফেলিয়ে অনলে,
মানুষ মানুষ সাজি হও রে ভারতে
কি লিখিব? লিখিতেছি আপনার কথা,
পুরোভাগে লিখিবার শত উপাদান
এ সকল পরিহরি স্বার্থ নিয়ে বসে?
আজ ভারতের মাঝে উঠেছে উচ্ছ্বাস
এনেছেন নররাজ মহা জাগরণ
বৈদেশিক হস্ত ন্যস্ত অপূপের ভার
ক্ষুধাতো মেটেনা তাহে, ক্ষুধার জ্বালায়
বুভুক্ষু তস্কর নামে আজি নির্য্যাতিত।
"ছনিয়ার চোর করে সাধুরে তস্কর,

সাধু যদি সাধু থাকে রাজার বিধান
অসাধু করিয়ে তারে দাগা দিয়ে দেয়।
পদে ভর দিয়া, দাঁড়াইতে চাও যদি
(দেখিবে রাজ্যের [illegible] হইয়াছে রাঙা
Gypsy কি ভাল নয় তোমাদের চেয়ে ?
আরবের নরচারী, দস্যু বেদুইন
তারও মুখে বার হয় পুলকের হাসি।
আমরা কে ? বনীয়াদী গোলাম দুজ্জন
ভগীরথ এনেছিল নিম্মল জাহ্নবী
পরশিয়া যার নীর নর নারী যত
মনের কলুষ রাশি করিতেন দূর।
এনেছে শিক্ষিত রাজ বিশ্বের আদর্শ
ক্ষমতায় অদ্বিতীয় কৌশল্যে দুর্জ্জয়
শত শত মদ্য-লিথি • ভারত মাঝারে
পান করি পাশ্চাত্যের এই সোমরস
সহস্র সহস্র নর বিনা সাধনায়
পশুত্বের নিম্নস্তরে করিছে গমন
ভারতের রাজা কেবা ? এ রাজ্য কাহার
এ রাজ্য এ দেব রাজ্য কাহার জানিনা
এই মাত্র বুঝি ইহা ইংরাজের করে
প্রবঞ্চক একদিন বিশ্বাস গরিমা
নষ্ট করি দিয়াছিল প্রলুব্ধ হইয়া।
ওই সেই মিরজাফর কলঙ্কী দুষ্‌মন
বদবখৎ দুরাচার নরকের কীট
আবার এসেছে বুঝি সেই মিরজাফর
ম্যাজিক মানেনা এ যে Lagic এতে দড়
স্বগত সুন্দরী কহে 'দাঁড়া'য়ে কাননে
Ingratitude thou marble hearted fiend
বাঙ্গালার চিত্ত ; চিত্ত ফেলিয়া নিশ্বাস
বলে শুনি' আকাশের মুখ পানে চেয়ে
Blow blow thou winter wind
Thou art not so unkind
As man's ingratitude
বৈপিনীক বীণা ওহো স্বদেশীর দিনে
শুনে ভেবেছিনু মনে ব্যাধের এ বীণা
ও কাকলী চালে নাই প্রেমের লহরী
ও কাকলী টানে নাই চিত্ত রাধিকার
সে দিনের Euripides দামিনী উল্লাস
নিখিল ভারত গর্ব্ব রবি উদ্দীপনে
জেগেছিল বঙ্গভূমি, তোমরা দোয়ার
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করি লুঠিতে সুখ্যাতি—
কি আছে তোমাতে বল সারাল শাঁসাল
কত লেখা লিখে ছিলে এখনো লিখিছ
পেচো ধরা ভ্রূণ যথা আতুর কুটিরে
জনমিয়া মরে যায়, জননীর বুকে,
তোমার Logic সিক্ত হিজি বিজি গাথা
বাহির হইবা মাত্র মরণেরে ভজে।
ভাষার মূর্চ্ছনা শুধু কানের ভিতর
ক্ষণিক অমিয় ধারা করে বরিষণ
ভাব হীন বলে ভাষা প্রাণের ভিতর
আবেগ বিমর্দ্দজাত প্রবল উচ্ছ্বাস
কখনোতো পারিল না তুলিতে পুলক
তুহিন ধরন ভাব পশ্চিম দেশের
বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে পরশে তোমার
ছান্দোগ্য সঞ্জাত ভাব কোন্ দেবতার
হৃদয়-গোমুখী হ'তে হয়ে নিষ্কোষিত
নিখিল ভারতবর্ষ করিছে নবীন
কি বৈশদ্যে—পরিপূর্ণ ভাবের লহরী
নাহি কোন রূপসীর রূপের বিস্তার
নাহি কোন সুন্দরীর চোকের ঠমক
নাহি পদ্মিনীর কোন গন্ধ প্রলোভন
আছে করুণার হোথা লাবণ্য মাধুরী
সহানুভূতির আছে ছন্দ ঝরা গতি
আছে চিন্ময়ের তরে প্রাণের আবেগ।
আর আছে স্বাস্থ্যক্ষুণ্ণা অবসন্না ক্ষীণা
দেশমাতৃকার তরে আগ্রহ প্রকাশ।

Lethe নরকের নদী।

কি কঠোর জড়ময় পশ্চিমের নীতি
শাসনের blister রসনা উপর
ঢেলে দিয়ে মূক করি রাখিবে তোমায় ।
বাসের অযোগ্য ভূমি হতেছে জগত
অসম্মানে ন্যায়ের বক্ষে করুক আঘাত
পিশুন ন্যায়ের চক্ষে দিক ধূলা ঢালি
ন্যায়ের আসন ইথে টলিবেনা কভু ।
christ এর মন্ত্রশিষ্য সমগ্র পশ্চিম
ন্যায়ের কি বিকলাঙ্গ করিছেনা শুনি ?
A fool at forty is a fool indeed
হোক তবু তোমা যদি পাইতাম সখা
ছাত্র ভাবে নাহি হোক মিত্র ভাবে ধর
Violence বিরহিত ferule হাতে
শিখাতেম, নির্ব্বাচিত পন্থা তব সখা
মহাজন পরিত্যক্ত বিনাশ আশ্রয় ।
দাসত্বের চাপে আজি কণ্ঠাগত প্রাণ
প্রতিপদে অপমান, প্রতি অপমানে
আত্ম-মর্য্যাদার বুকে উঠিতেছে কাটি
মানুষের মানবোধ ছিল না কি সখা—
Logic খচিত তব হৃদয়ের মাঝে ?
জান না কি হে কোবিদ সম্মান-লোলুপ
সে মর্য্যাদা চিত্ত হোতে পলায়েছে দূরে
কি হয়েছে বল দেখি হয়েছি মিথ্যুক,
হয়েছি বিলাস প্রিয় হইয়াছি ভীরু
শিখিয়াছি আত্মগান করিতে কীর্ত্তন
শিখিয়াছি পরমুখে করিতে শ্রবণ
আপনার যশোগাথা পুরস্কার দিয়া ।
ক্ষমতার মঞ্চে যদি অপকর্ম্মী বসে
শিখিয়াছি তারও পদ করিতে পূজন
দুর্ব্বল যে প্রাণে তার জাগে আহনিশ
মরণের ঘূর্ণ্যমান লোহিত লোচন
জীবনের মধ্যস্থলে বসায়ে মরণে
প্রাণের ব্যর্থতা দিয়ে করে তারে প্রীত ।
যে দিন জীবন লয়ে আসে আগন্তুক
হর্ষে দীপ্ত চারুকান্তি বিশ্বের মাঝারে
মরণ প্রহরী রূপে দাঁড়ায় শিয়রে ।
মরণ আছিল পূর্ব্বে জীবনের পর
জীবন আছিল পূর্ব্বে মরণের পর
মরণের তপস্যায় জীবন—জীবন ।
জীবনে জীবন নাই আছে মৃত্যুভয়
আছে মাত্র অত্যাচার সহন ক্ষমতা
প্রাকৃত বিধানের বল কে লয়েছে হরে
কে শিখাল ভিক্ষা বৃত্তি করিতে গ্রহণ
যে শিক্ষায় চরিত্রের হয় প্রতিষ্ঠান
সে শিক্ষা কি আর আছে জগত মাঝারে ?
দুর্জন যে চিত্তে তার ক্ষমার উদ্ভব
কখনও কি হইয়াছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ?
পাশ্চাত্য শিক্ষায় সবে হয়েছি দুর্ব্বল
ধর্ম্ম হতে কর্ম্ম হতে আসিয়াছি সরে—
চিত্ত হতে ফেলিয়াছি উৎপাটন করি
সুপবিত্র প্রাচ্যভাব আর্য্য ধর্ম্ম নীতি ।
ভুলিয়াছি বেদস্তুতি বেদের সঙ্গীত
শিখিয়াছি রাজা হতে ক্ষীণ ভেদনীতি
অন্যায়ে করিতে দায় অবিশ্বাস দিয়া ।
নররূপে নারী মূর্ত্তি ক্লৈব্যের বিকাশ ।
কোন বিশেষণে তোমা করিব ভূষিত
ওই যে Englishman ভারত অরাতি
Logic মণ্ডিত তব ফেনিল লেখার
বুঝিবা thunderer নাম করিবে ধারণ ।
বর্ত্তমানে তুমি বুঝি Edsterling হবে
লুফে তাই লইয়াছ Place কেশরী
গরজন কর সাধু কাঁপায়ে ভারত
তব গরিমায় আজি গর্ব্বিত আমরা ।
ধর্ম্মপুষ্ট ন্যায় এই নিখিল সংসারে
আপনার দিব্য প্রভা করিবে বিস্তার
ওই দেখ চেয়ে দেখ বেথেলহাম আজ
পাইয়াছে ক্রুশবদ্ধ মেষ পালকেরে—
আজ মক্কা কার ধ্বনি করিয়া শ্রবণ

পুলকেতে ধরিয়াছে বিনয়ের হার—
শুচিমেধা প্রাণ হতে গোমুখী তরঙ্গ
তীব্রতা বুকেতে করি ছুটিছে ভারতে
পবিত্রতা নিঝরিণী পুলকে মাতিয়া
বিগলিত বৃন্দাবন হর্ষ বুকে ধরি—
চিত্তে চিত্তে ছুটিতেছে উলাস বহিয়া
সদাকুণ্ঠ ছিল প্রাণ জড়তা প্রভাব
আজ তারে বিকাশের পথে লয়ে যেতে
কে যেন বেণুয়া রবে করিছে সঙ্কেত
মাথা লয়ে মাথা খেলা নহেক স্বরাজ
দম্ভভরে প্রভুত্বের দাবানল জ্বালি
প্রাণের বৈচিত্র হরা নহেক স্বরাজ
মানুষের অধিকার মানুষকে দান
ন্যায়ের পবিত্র হর্ষ উপভোগ করি
যে পুলক পায় নর তাহাই স্বরাজ
ক্ষমতার তাজ পরা কুক্কুট হৃদয়—
আইনের প্রহরণ করিয়া ধারণ
দুর্ব্বলের নির্য্যাতন পেষণ যন্ত্রণা
দিয়ে যারা বড় হয় তারা বড় নয়
তারা বড় নয়—এই কথা বলিবার
অবাধ শকতি, এই শকতির নাম
নৈসর্গিক আধ্যাত্মিক নির্ম্মল স্বরাজ।

বুরোক্রেসি হৃদয়েতে নাহিক স্বরাজ
পশ্চিমের রাজনীতি অভিষিক্ত নহে
স্বরাজের প্রাণভরা শান্তির সলিলে।
ভীষ্মের ত্যাগের মাঝে আছিল স্বরাজ
ধর্ম্মপুত্র ধৈর্য্য মাঝে আছিল স্বরাজ
মরন্দ কপোল Plato হৃদয় ভরিয়া
স্বরাজের চলস্রোত হ'তো প্রবাহিত।
জড়বাদী পশ্চিমের স্বরাজের সুধা
পান করাবার তরে রবীন্দ্র বাউর।
চিদানন্দ প্রেমস্রোতে ভাসাতে পশ্চিমে
বিশ্বভারতীর গৃহ হতেছে নির্ম্মিত।

আমার জনম ভূমি প্রিয় শান্তিপুর
যারে বঙ্গ নরনারী মানে তীর্থ বলি
যেথায় অদ্বৈত মম উদ্ধতন পিতা
জনমিয়া ভক্তিরসে চিরদিন তরে
দিব্য স্থানে পরিণত গিয়াছেন করি
সেই শান্তিপুর মম গৌরবের খণি
শ্রীঅদ্বৈত বক্ষভেদি ভক্তি তরঙ্গিনী
এনেছিল স্বর্ণপদ্ম উজানে বহিয়া
সেই পদ্ম বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য প্রভু।
যার প্রেমে ভেসেছিল নহে শুধু সাধু
অসাধুও সাধু হয়ে অকৈতব সুখ
উপভোগি বৈকুণ্ঠেতে গিয়াছেন চলি
কোটি কোটি প্রাণমাঝে অদ্বৈত প্রভাব
প্রবেশিয়া, ব্যথা করিয়া সঞ্চিত
আনিয়াছে অভিশপ্ত ভারত মাঝারে
শুদ্ধ প্রাণ মহামতি দেবতা গান্ধীরে।
প্রকাম্যের প্রতিকৃতি গান্ধী মহারাজ
ভালবাসা দিয়া বিশ্ব করিবেন স্নাত।
চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ আকাশের পানে
অধ্যাত্ম শকতি আজ পশু বিক্রমেরে
করিতেছে পরিম্লান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে।
প্রতিহিংসা দানবের অব্যর্থ আয়ুধ
ভালবাসা দেবতার অমৃত নিছনি—
জেতার হৃদয় হ'তে তীব্র দাবানল
ভালবাসা ঢেলে দিয়ে গুর্জ্জর নির্জ্জর
করিবেন শান্তিরাজ্য জগতে স্থাপিত।
জড়বাদী জড়তার ভাঙ্গি কারাগার
চিন্ময়ের প্রেমে প্রাণ করিবে শীতল।
অঞ্জন তোমার চোখে জ্ঞানাঞ্জন আজ
প্রদান করেছে ভাই চাহ আঁখি মেলি
ইচ্ছা করে একবার বিপিন! তোমার
প্রহ্লাদ জ্ঞানের ভাই বুকে টেনে লই
তুমি যে জ্ঞানের পিতা প্রহ্লাদ জনক।
জ্ঞানাঞ্জনে চেয়ে দেখ Gregory বিকাশ

Basil বালকচিত্ত চিতচোরা হাসি
জ্ঞানাঞ্জন কি সরল সখাগত প্রাণ
সখিত্বের মাধুরীতে স্নাত তার চিত
উৎপীড়িত বন্ধুতরে বন্ধুর পরাণ
কেঁদেছিল তাই বাপ কাষ্টের সাগরে
ঝম্প দিয়ে নরকুলে ধন্য হ'য়ে গেল
মানুষতা পাশবতা দুইটী সুন্দরী
বিজন হৃদয় মধ্যে দোঁহে করে বাস
পাশবতা শক্তিময়ী কৌশলে সখীরে
কুরস করায়ে পান করে সংজ্ঞাহীন
পশুত্বের সে কৌশল আজ্জিম্রিয়মান
বিধাতার দান ওই মধুর প্রেরণ
পশুতায় নির্ব্বাসিত করেছেন ধীরে।
ওই দেখ মতিলাল নির্ম্মল শশাঙ্ক
জ্ঞানের ধবল জ্যোতি বিকশিত প্রাণ।

ওই দেখ মোজাহেদ তেজস্বী আজাদ
আত্মোৎসর্গ করেছেন ধর্ম্মের লাগিয়া।
ওই লিলারাণী ওই বান্ধব Stokes
বরিশাল ধন্য করা শরৎকুমার
আমার গৌরব বর্দ্ধি সরল নৃপেন
ওই ভগ্না সরোজিনী কল্যাণী সরলা
মনস্বিনী তেজস্বিনী—সাবিত্রী সাবিত্রী
জ্ঞান রসাপ্লুত ওই প্রতিভা জিতেন
ন্যায়ের চরণে যিনি সঁপেছেন প্রাণ
যার চক্ষুদীপ্তি স্পর্শে অযুক্তি পলায়
তার ছবি আজি সখা কর বিলোকন
শিশিরের প্রতিচ্ছবি বঙ্গমতিলাল
গলিত মৌক্তিক ধারা যার লেখা হ'তে
পশু শক্তি বুকে অগ্নি করে উৎপাদন
শান্তশীল সে লেখায় আস্বাদে অমৃত
গোলাপ সুবাস ওই মধুর সুভাস
স্মরণে যাহার কথা নেচে উঠে প্রাণ
শতদল শাসমল যাঁর পরিমলে
সমগ্র ভারত-ভূমি আজ বিমোহিত
ওই দেখ চেয়ে দেখ বাসন্তী হোথায়
বিলাসের ভস্ম রাশি মাখিয়া শরীরে
জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ধরি দ্বারে দ্বারে দেবী
নবীন আশ্বাস বাণী করেছেন দান।
দম্ভ আজি দূরে ফেলে প্রমাত্তা সুন্দর
চারিদিকে চেয়ে দেখ দেবতার ছবি
রাষ্ট্র শক্তি যত কেন হউক বিকট
অদম্য অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ ভয়াল
সে শক্তি ও হয় লীন তাঁহারি ইক্ষণে
যাঁহার বৈদগ্ধ্যে বিশ্ব এত মনোরম।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

শিক্ষায় প্রতারণা।

পাঠশালায় যখন পড়িতাম, তখন গুরুমহাশয়কে ভয় এবং ভক্তি দুইই করিতাম, অত্যন্ত গুরুতররূপে। একমাত্র গুরুভক্তির প্রভাবে, কত অসাধ্য সাধনই না হইতে পারে, শিশুকালেই অনেক গল্পে, পাঠশালায় প্রবেশ করিবার অনেক পূর্ব্বেই তাহা জানিয়া ফেলিয়াছিলাম। সুতরাং প্রথম হইতেই অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুভক্তি করিতে লাগিলাম। এ যে ঘোর কলিযুগ তাহা কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই। সত্যযুগের মত এ যুগেও গুরুভক্তের নিকট অসাধ্য কিছুই নাই, এই ছিল তখন দৃঢ় বিশ্বাস। আর অতি শৈশবেই শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম 'গুরোর্দোষাবরণং ছত্রম্" অর্থাৎ যে গুরুর দোষকে আবরণ বা লুকাইয়া রাখিতে পারে, সেই প্রকৃত ছাত্র। কাজে কাজেই প্রকৃত ছাত্র হইবার লোভে, বিনা বিচারে বাবাকে মাকে লুকাইয়া ও গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তামাক, গাছের লাউটা, শাক কলাটা ইত্যাদি যখনই সুবিধা পাইলেই, গুরুমহাশয়ের শ্রীচরণে আনিয়া উপস্থিত করিতাম। পাঠকপাঠিকাগণের নিকট ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি কথা সত্য। মাঝে মাঝে বাবামায়ের সতর্কদৃষ্টি এড়াইতে না পারিয়া ধরা পড়িয়াও যাইতাম, কিন্তু প্রাণান্তেও গুরুমহাশয়ের দোষটাকে সযত্নে আবরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতাম না। গুরুর একান্তভক্ত আমরা চোর, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলিয়া গণিত হইলেও গুরুভক্তি হইতে কখনও একচুল বিচ্যুত হইতাম না।

গুরুভক্তির গুরুত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, ততই প্রথমে বাবার পকেটের পয়সা, পরে মা'র আঁচলের চাবী এবং ক্রমশঃ পাড়া-পশীর গাছের আম, মাচার কুমড়া বা শসা এবং ক্ষেতের আলু পটলগুলি একটার পর আর একটা করিয়া কি যাদুমন্ত্র বলে যেন কোথায় অদৃশ্য হইতে লাগিল। আমাদের সময় সময় মনে হইত, হয়ত বা আমাদের এই গুরুতর তপস্যার প্রভাবে ইহারা সশরীরে সজ্ঞানে স্বর্গেই বা গমন করিয়া থাকিবে। যাক্, পাঠশালায় গুরুমহাশয় বিদ্যাদান অপেক্ষা বেত্রদানই করিতেন বেশী এবং আমরাও বেতন অপেক্ষা ভক্তি প্রদর্শন করিতাম আরও অনেক বেশী। উভয়ত্রই বেশ প্রাঞ্জল প্রতারণা।

তারপর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঢুকিলাম। গুরুভক্তির প্রবল স্রোতে একটুকু মন্দা পড়িল বটে, আর পাড়াপশীর ক্ষেত্রের বা মাচার জিনিষগুলি ভাসিয়া যাইত না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাবার পকেটের পয়সা যেন কেমন করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত! আমরা চাঁদা করিয়া ছুটির পূর্ব্বে কোনও শিক্ষক মহাশয়কে ছাতা, কেহকে বা জুতা আবার অপর কেহকে বা দোয়াতদান বা fountainpen অর্ঘ্যস্বরূপ দিতাম। তবে একথা ধ্রুব সত্য, যে পাঠশালায় গুরুমহাশয়কে যেমন অবিচারে পরমভক্তির সহিতই দিতাম, এক্ষেত্রে ঠিক ততটা হইয়া উঠিত না। শাস্তির ভয়ে, পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইবার লোভে, বা প্রথম-দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার আশায় মাঝে মাঝে কোন কোন শিক্ষক মহাশয়গণকে এইরূপে পূজা না করিলে তাঁহারা প্রসন্ন থাকিতেন না। আমার কথাগুলি যে নিখুঁত সত্য,

তার প্রমাণ স্বরূপ সম্প্রতি কলিকাতা সহরের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয়দ্বয়ে যে, অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রামের বিদ্যালয়ে যখন পড়িতাম, তখন মনে করিতাম, শুধু পাড়া-গেঁয়ে অনুদারমনা শিক্ষকগণই এরূপ করিয়া থাকেন। তারপর, ওহরি! ক্রমে অবস্থার বিপর্য্যয়ে দুই তিনটি সহরের বিদ্যালয়ে, এমন কি নগরের দুই একটা বিদ্যালয়েও পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু, হায়, সর্ব্বত্রই, কখনও বেশী নম্বর পাইবার আকাঙ্ক্ষায়, কখনও বা প্রথম দ্বিতীয় হইবার আশায় কিম্বা শুধু প্রভু (master) দের সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইত। প্রতিদান স্বরূপ তাঁহারা ক্লাসে আমাদিগের একটুকু আব্দার সহ্য করিতেন; যে অপরাধে অপরের বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত, সেই অপরাধেই আবার আমরা তাঁহাদের ন্যায্য বিচারে বেকসুর খালাস পাইতাম। কতদিন দেখিয়াছি, আমার অপরাধে নির্দ্দোষ রামা ভূতো মার খাইয়া মরিয়াছে। অবশ্য মাঝে মাঝে যে দুই একজন উন্নতমনা, উদারপ্রাণ, স্নেহপরায়ণ শিক্ষকও লাভ করি নাই, এমনও নয়। মনে হয়, এদের পুণ্যেই আজও শিক্ষক নামটা একেবারে জঘন্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

এবার শিক্ষক মহাশয়দের আর একটা মহৎ গুণের কথা ব'লব। তাঁহারা অনেকেই একমুখে তিন চার রকমের কথা বলিতে পারেন। আমাকে হয়ত বলিলেন—'তোর কোন জন্মেও কিছু হইবে না', আবার আমার অভিভাবক মহাশয়কে বলিলেন, "না আপনার ছেলে আজ কাল একটু একটু ক'রে পড়াশুনা করছে, ছেলেত বোকা নয়, একটুকু খেলার দিকে বেশী ঝোঁক্, এই যা দোষ, তা দুদিন পরে শুধ্‌রে যাবে।" আবার প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বলিলেন—"এ ছেলেটার জ্বালায় ক্লাস পড়ান যায় না, অবিশ্রান্ত সকলকে জ্বালায়।" অথবা, "কি করে আর লেখাপড়া হবে, বলুন; আজ আপনাদের ম্যাচ্, কাল আপনাদের সভাসমিতি, আবার পরশু আপনাদের বক্তৃতা, ছেলেরা পড়াশুনা করবে কখন?" যে শিক্ষক মহাশয় আমাকে দিনে দশবার বলেন যে আমার কিছু লেখাপড়া হবে না, তাঁকেই যদি আমার গৃহশিক্ষক রাখিবার জন্য প্রস্তাব করি, অমনি তিনিই আবার ব'লতে আরম্ভ করেন, "তুই ভয় পাচ্ছিস্ কেন রে? তুই ত আর নেহাৎ বোকা নস্, দুমাস আমি পড়ালে দেখ্‌বি তুইও একজন ভাল ছেলে হয়ে পড়্‌বি।"

আবার কেহ কেহ ক্লাসে আসেন বেশ একটু দেরী করিয়া। তারপর আসিয়াও "লিখ্ লিখ্ পড়্ পড়্" এমনি একটা কিছু করিয়া কোনওরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু কাটাইয়া দেন। কেউ বা ক্লাসে বসিয়া নিদ্রাদেবীর সেবা করেন, কেউ নভেল বা উপন্যাসের রস আস্বাদন, কেউ বা নিজেদের চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি আরো কত কি কাজ করেন। কোনও কোনও শিক্ষক মহাশয় আবার সময় সময় ছাত্রদের শুনাইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের বলিয়া থাকেন, "পঁচিশ টঙ্কায় আর কতই বা পড়াইব। পেটে খেলে পিঠে সয়।" এখানেও সেই প্রতারণা।

তারপর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের কথাটাও একটুকু বলা দরকার। শুধু শিক্ষক আর ছাত্র লইয়াই ত স্কুলটা নয়? ইহার যে আবার উপরওয়ালা আছেন। প্রায়ই দেখা

যায়, মাঝে মাঝে দুই একটি এমন অপূর্ব্ব ছাত্রের আগমন হয়, যে তাদের জ্বালায় সমস্ত স্কুলটি অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। শিক্ষক মহাশয়গণ, এমনকি কর্ত্তৃপক্ষগণ পর্য্যন্ত, অনেক সময় তাহাদিগকে বাগে আনিতে পারেন না তাহারা স্কুলের অনেক ছাত্রের মস্তক ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ সব জানিয়া শুনিয়াও শুধু ৩টি বা ৪টি টাকার লোভে কিছুতেই তাহাদিগকে তাড়াইতে বা সরাইতে পারেন না, এবং আরও আশ্চর্য্যের কথা, প্রতিবৎসরেই তাহারা প্রমোশন পায়। কেন না, নচেৎ যে স্কুলের আয় কমিয়া যায়! এখানেও সেই প্রতারণা॥

স্কুলকেই বা শুধু বলি কেন। আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়েরও যে আবহাওয়া বদলে গিয়েছে। যে সব ছাত্র হেড্ মাষ্টার মহাশয়দের হাতে একশতের মধ্যে ১৫।২০ পায়, তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপার কৃপায়, হয়ত বা প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এমনও শোনা যায়, যে কেহ ২৫ নম্বর মাত্র উত্তর করিয়া ৩০।৩২ নম্বরও পাইয়াছে। না পাইলেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলিবে কেমন করিয়া? যাক্, আমরা কিন্তু গোড়াতেই একটা বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয় কথাটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়াই এতগুলি অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এ যে বিশ্বের সকল বিদ্যারই আলয়, তা ভুলিলে চলিবে কেন? আর প্রতারণাটাও কি একটা বিদ্যা নয়?

যাক্ কোনও রূপে স্কুলের পড়া শেষ করা গেল, এবার কলেজে ঢুকিবার পালা। ওমা, সেখানে ঢুকিতে গেলে কোথাও শুনি সিট্ (স্থান) নাই, কোথায়ও শুনি কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে'? ইত্যাদি। কিন্তু, প্রায় অনেক স্থানেই কেরাণী সাহেবের পকেটে যদি আমার দক্ষিণ হস্তটি একবার প্রবেশ করাইবার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ভর্ত্তি হইতে কোনও গোলমাল প্রায় হয় না। এখানে গোড়ায়ই প্রতারণা। বড়র সবই বড় কিনা। তার পর ক্লাসে রামের পরিবর্ত্তে শ্যাম হাজিরা দেয়, কতজন বিদেশে থাকিয়াও proxy দেবার কৃপায় প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকে। আবার ক্লাসের exercise বা পরীক্ষাদির সময় কেহ নোটবুক দেখিয়া লিখিতে থাকে, কেহ অপরের প্রশ্নোত্তর পত্র দেখিয়া অবিকল তাহা নকল করিয়া দেয় ইত্যাদি, ইত্যাদি! প্রফেসর মহাশয়গণ ইহা দেখিয়াও দেখেন না, এসব তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁহাদের মস্তিষ্কের অপব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। অথবা, "ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ" এই নীতির সম্মানের জন্য "বোবার শত্রু নাই', সাজিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া থাকেন। কত স্কুলের ছাত্র, কত কলেজের ছাত্রকে বলিতে শুনিয়াছি, "কি করিব বলুন ত, আমরা এত কষ্ট ক'রে খেটে খুটে পড়ে যাই, আর ওরা সব কিছু না পড়ে শুধু টুকে আমাদের থেকে কত বেশী নম্বর পায়! তারপর পরীক্ষায় বেশী নম্বর না পাইলে, কোনও অভিভাবক মারপিট্ করেন, কেউ বা গালিগালাজ করেন, আবার কেহ কেহ বা গৃহশিক্ষকের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করেন; এক্ষণে এসবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে না টুকে উপায় কি?" ক্রমে ক্রমে তাহারাও একটু একটু করিয়া এই সব অসদুপায় শিক্ষা করিতে থাকে। ইহার নাম যদি বিদ্যালয় বা শিক্ষালয় হয়, তবে যমালয় বা পাপালয় কোথায়?

এদিকে আবার দুই বৎসরে কোনও বিষয়ের ৪ খানা কেতাবের মধ্যে মাত্র দুইখানি পড়ান হইল; কোনও বিষয়ের মাত্র একখানি, আবার কোনও বিষয়ের নাম মাত্র পড়ান হইল। তোমরা ছাত্রগণ যেমন করিয়া পার, বাকী কেতাবগুলি তৈয়ারী করিয়া লও। আমাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক, তোমরা পূর্ণ ২টি বৎসরের বেতন দিবে, common room না থাকিলেও, তার জন্য চাঁদা দিবে, লাইব্রেরী না থাকিলেও পুস্তকের ব্যবহারের জন্য টাকা জমা দিতে হইবে, ইত্যাদি; আমরা ইহার বিনিময়ে তোমাদিগকে percentage দিব, allow করিব, বস্, আর অধিক কি চাও? পড়তে হয় বাড়ীতে শিক্ষক রাখ অথবা নিজে যেমন করিয়া হউক ৭ খানা ইংরাজীর ৫ খানা পড়িয়া ফেল, ২ খানার বেশী পড়াইবার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব না।" এ যদি প্রতারণা বা দোকানদারী না হয়, ত প্রতারণা বা দোকানদারী কি?

যাক্ কলেজের জীবনও একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসাগর ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলাম। এখানে আবার আর এক কাণ্ড। অমুক পরীক্ষকের শ্যালক অঙ্কে ৭ নম্বর কম পাইয়াও উত্তীর্ণ হইল, আর রমেশ চক্রবর্ত্তী ১ নম্বর কম পাইয়াছে বলিয়া উত্তীর্ণ হইল না। অমুক চন্দ্র ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী বিশেষের আত্মীয় বা পুত্র, সুতরাং যে যাহাই লিখুক না কেন, তাকে প্রথম করিতেই হইবে। কেহ মামার কৃপায়, কেহ মেসোর দয়ায়, কেহ ভগ্নীপতির অনুকম্পায়, কেহ বা বাবার নামের ঠেলায়, আবার কেহ কেহ বা সুপারিশের বা তদ্বিরের প্রভাবে অনুত্তীর্ণ হইয়াও উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আর যাদের মামা মেসো পিসে বাবা কেহ নাই, তারা অধিকতর উপযুক্ত হইলেও অনুত্তীর্ণই থাকিয়া যায়। আর প্রতারণা কি গাছে ধরে!

এবারে শেষের পালা। পরীক্ষাসাগর যতই দুস্তর হউক না কেন, আমরা বাঙ্গালী, মহাবীরের বংশ কিনা জানি না, তবে সে দেশে জন্ম বলিয়া, অন্ততঃ তাহার হাওয়ায়, আমরা অনায়াসে সে সাগর পার হইয়া যাই। সুতরাং আমিও পরীক্ষাসাগর সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইলাম। মনে আশা এতকালের পরিশ্রম, এতকালের প্রচেষ্টা, এতকালের গুরুভক্তি বা গুরুপূজার অর্ঘ্যোপহার, এবারে সফল। এবারে সরস্বতীর কৃপায়, লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ ঘরের মেজে এসে ঠেসে বসলেন আর কি। হোলও ঠিক তা-ই। লক্ষ্মীঠাকরুণ নোলক্ ঝুলিয়ে, ইহুদী মাকড়ী দুলিয়ে, মলবাজায়ে, প্রাণ মজায়ে, ঘর সাজায়ে এসে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তাহার ভাণ্ডারের চাবিটি আন্‌তে ভুল গেলেন! এত পড়েশুনে, শেষে শুধু হা অর্থ! হা অন্ন! ওঃ, আগাগোড়াই কি ভীষণ প্রতারণা!!!

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিগত * প্রস্তাবে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ দেখিতে পাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচীন পদ্ধতি হইতে কতদূর ব্যাপক এবং উপকারী হইয়াছে। আমরা গত প্রস্তাবে কেবলমাত্র সংস্কৃত-বিভাগের সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কেবল তাহাই দেখাইয়াছি। বঙ্গদেশের অভিভাবকবর্গ এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইতেছে এবং তাহাতে কিরূপ 'যুগান্তর' আনয়ন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। ইহার কারণ এই যে, এই শিক্ষা পদ্ধতির যে বিবরণ সময়ে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয়, তাহা ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ বাহির হয় নাই। এই নিমিত্তই এই শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার লোকদিগের মধ্যে ভাল করিয়া প্রচারিত হইবার সুবিধা পায় নাই। যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, কেবল তাহাদের মুখে শুনিয়া, অভিভাবকেরা এতৎ সম্পর্কে যাহা কিছু জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু ছাত্রবর্গের মুখে প্রচারিত বিবরণও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাহার কারণ এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে যতপ্রকারের বিভাগ আছে, সকল বিভাগের সকল ছাত্রের মুখে একসঙ্গে সকল কথা শুনিবার সম্ভাবনা কোন অভিভাবকেরই নাই। কেন না, সকল ছাত্র ত সকল বিভাগে অধ্যয়ন করে না। প্রধানতঃ এই কারণেই, আজ পর্য্যন্ত এই শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিভাবক এবং দেশের লোক অনভিজ্ঞ রহিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি দেশের লোক সকল বিষয়ের বিশেষ সংবাদ ভাল করিয়া জানিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এ প্রকার ব্যবস্থা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এবং এই ব্যবস্থানুসারে ছাত্রবর্গ যে মহতী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইতেছে, সে সুযোগ অন্য কোথায়ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই শিক্ষাকে একপ্রকার সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলে বোধ হয় কোন অতিরঞ্জিত কথা বলা হইবে না। এই প্রস্তাবে আমরা বঙ্গীয় অভিভাবক বর্গের এবং দেশের লোকের জানিবার সুবিধার নিমিত্ত প্রধান প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই ব্যবস্থা সর্ব্বতোমুখী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য কি না।

আমরা গত প্রস্তাবে কেবল মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং সেই ব্যবস্থা পূর্ব্বের ব্যবস্থা হইতে কতদূর বিভিন্ন, তাহা দেখাইয়াছিলাম। তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকল ছাত্রের পক্ষেই আটখানি প্রশ্ন পত্রের উত্তর লিখিতে

---

*নব্যভারত, গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।"

হয়। এই আটখানি প্রশ্ন পত্রের মধ্যে, প্রথম চারিখানি প্রশ্ন পত্র তত্তৎ বিষয়ের পরীক্ষার্থী সকল ছাত্রের পক্ষেই গ্রহণীয় প্রশ্ন পত্র। কিন্তু অপর চারিখানি প্রশ্ন পত্র কেবল তাহাদেরই নিমিত্ত, যাহারা সেই বিষয়ের বিশেষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের অভিলাষী। প্রথম চারিখানি প্রশ্ন পত্র সাধারণ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করে এবং শেষ চারিখানি প্রশ্ন পত্র বিশেষ-জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য নির্ম্মিত করা হয়। ইহাতে এই সুবিধা হইয়া উঠিয়াছে যে, যে ছাত্র যে বিষয়টীই গ্রহণ করুক্ না কেন; সেই ছাত্রের সেই বিষয়টীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং বিশেষ জ্ঞান—উভয় প্রকার জ্ঞান লাভের সম্বন্ধেই সহায়তা করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ছাত্রটীকে সেই সেই বিষয়ে কি প্রকার নিপুণ ও পটু করিয়া তোলা হইল, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কি প্রকার বিস্তৃত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিষয়নির্ব্বাচন হইতেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

আমরা সংস্কৃতের কথা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি। তদ্দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সংস্কৃতের সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে, এবং সকল বিষয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগেই, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে, যাহাতে ছাত্রদিগের সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকার জ্ঞানই উপার্জ্জিত হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সংস্কৃত ব্যতীত, পালি-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, সে পদ্ধতিটা পালি-বিদ্যার সম্পূর্ণ সর্ব্বদিক্‌ব্যাপিনী শিক্ষালাভের পথকে সুগম করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে যে দিগন্তপ্লাবী বৌদ্ধধর্ম্মের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই আন্দোলনের ফলে, বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ইতিহাস, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ কলাশিল্প—প্রভৃতি অমূল্য বিদ্যাগুলি একদিন ভারতবর্ষকে মহতী সমৃদ্ধিতে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছিল। কত প্রদেশের কত মহা মহা বিদ্বদ্বর্গ, কতকাল একান্ত পরিশ্রম করিয়া—এই সকল বিদ্যার যে পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধদিগের এই সকল রত্ন অধিকাংশই পালি-ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ-যুগের সেই সকল মূল্যবান্ শাস্ত্র ও বিবিধ ক্রিয়িনী বিদ্যার জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই পালিভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। পালিভাষা শিখিয়া, সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য-দর্শনাদি বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। একটা কথা এই সম্বন্ধে বলিলেই এই শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে পারিবে। হিন্দুর বিশ্ব-বিখ্যাত বেদান্ত দর্শনে আমরা যে মায়াবাদ দেখিতে পাই, যে মায়াবাদের উপরে বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত, সেই মায়াবাদটী কিছু একদিনেই, আকাশ হইতে বৃষ্টি-ধারার সহিত পতিত হইয়া, বেদান্ত দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এই মায়া-তত্ত্বটী এই আকারে পরিণতি পাইবার পূর্ব্বে, বহুদিন হইতে বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্য-বাদ, বিজ্ঞান-বাদ, স্যাদ্বাদ প্রভৃতি মতগুলি ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। এই সকল মত বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীর বিবিধ শাখায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহুদিন হইতে আলোচিত হইয়া হইয়া, ক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছিল। বেদান্তে যে আজ মায়াবাদ ও নির্গুণব্রহ্মতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বুঝিতে

হইলে, ইহার ইতিহাসটী বুঝিতে হয়। এই ইতিহাসে, ইহার ক্রম-পরিণতি ও পুষ্টির ইতিহাস গ্রথিত রহিয়াছে। কিন্তু এই ক্রম-পরিণতি ও পুষ্টি বুঝিতে হইলেই, বৌদ্ধগণের দর্শন-শাস্ত্র জানিতেই হইবে। নতুবা এই মায়াবাদ ও নির্গুণব্রহ্মবাদ, কোথা হইতে আসিল এবং কোন্ কোন্ চিন্তা-প্রণালীর, কি প্রকার পরিণতি দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইতেছিল এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ইহা কিরূপে বেদান্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিল,—এ সকল কথা না বুঝিতে পারিলে বেদান্তের মূল ভিত্তিস্থানীয় নির্গুণব্রহ্মবাদের কথা ও মায়ার তত্ত্বটী আদৌ বুঝিতে পারা যাইবে না। কিন্তু ইহার আদিম চিন্তাপ্রণালী ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মত-বাদগুলির তত্ত্ব—যাহার পরিণামে মায়াবাদ ও ব্রহ্মবাদ উৎপন্ন হইল—তাহা বুঝিতে হইলেই পালি-গ্রন্থাবলীর শরণ লইতে হইবে; পালিতে রচিত বিবিধ মতবাদের ঐতিহাসিক আলোচনা করিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম যে, হিন্দুদর্শনশাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে হইলেই, বৌদ্ধবিদ্যার আলোচনা করিতেই হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্র বুঝিতে হইলেই পালি বুঝিতে হইবে ও পালি-রচিত গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করিতে হইবে। নতুবা হিন্দুদর্শন ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই দুই বিদ্যাই প্রাচীনকালে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সেই পালিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পালির বিবিধ বিভাগের প্রত্যেক বিভাগকে এক একটা মুখ্য বিভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া, প্রত্যেক বিভাগের জন্যই আটখানি করিয়া প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে এইরূপে সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞান—এই দুই-এরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যেই আবার প্রাচীন "লেখা-মালা" শিক্ষার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পালির ইতিহাস, পালির দর্শন, পালির সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি লইয়া এক একটা পৃথক্ বিভাগ রচিত হইয়া, শিক্ষাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

অবিকল এই প্রণালীতে আরবী এবং প্রাকৃত শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং তদনুসারে ছাত্রবর্গ অধ্যয়ন করিতেছে।

এই সকল ভারতীয় বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের "প্রাচীন ঐতিহাসিক শিক্ষা" বিভাগের উল্লেখ করাও নিতান্ত আবশ্যক। এই বিভাগটী Ancient Indian History and Culture অর্থাৎ—"ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও বিশেষবিদ্যা"—নামে পরিচিত। যে সকল ছাত্র এই বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভারতের প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত প্রায় তাবৎ বিদ্যার সহিতই পরিচয় হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই বিভাগে—প্রথম চারিখানি সাধারণ জ্ঞানলাভের উপযোগী প্রশ্নপত্রের উপাদান স্বরূপ,

(১) বৈদিক সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের ইতিহাস

(২) মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তীকালের সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতত্ত্ব (পালরাজগণ ও সেনরাজগণ সম্পর্কিত বিবরণ সহ)।

(৩) ও (৪) প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব, হিউনসাঙ্ লিখিত বিবরণ সহ। ভুবন-কোষ সম্বন্ধীয় বিদ্যা প্রভৃতি নিবদ্ধ আছে

এতদ্ব্যতীত, বিশেষজ্ঞানলাভের উপযোগী বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম বিভাগে অশোক, শুঙ্গ ও সাতবাহন রাজগণের লিপিসমূহ এবং ক্ষত্রপ ও গুপ্তরাজগণের লিপিমালা। দ্বিতীয় বিভাগের জন্য কলাশিল্প ও প্রস্তরশিল্প এবং তৃতীয় বিভাগে বিভিন্ন নৃপতিবর্গের সাময়িক নানাপ্রদেশস্থ মুদ্রার বিবরণ এবং চতুর্থ বিভাগে অতি প্রাচীন স্থপত্য বিদ্যার বিশেষ বিবরণ—এই সকল শিক্ষণীয় বস্তু আছে। এই চারিটি বিভাগ লইয়া একটী শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। এই শ্রেণীতে সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রভৃতি-সূচক এবং লোক গণনা সম্পর্কিত তত্ত্ব—এইগুলি লইয়া চারিটী বিভাগ আছে। তৃতীয় শ্রেণীটী ভারতের ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস বিষয়ক। ইহাতে বৈদিকযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব, পৌরাণিক-যুগের ধর্ম্ম বিবরণ, বৌদ্ধ-সময়ের ধর্ম্মেতিহাস, জৈনধর্ম্মের ইতিবৃত্ত—প্রভৃতি বিভাগের গঠন করা হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীটা ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বিরচিত। এই শ্রেণীতে ভারতের গণিতবিদ্যা, পরিমিতি শাস্ত্র, বীজগণিত, লীলাবতী, শুল্বশাস্ত্র, ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ও তাহার ইতিহাস, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থাদি সমস্তই অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পঞ্চম শ্রেণীটী নৃতত্ত্ব, বিষয় লইয়া গঠিত। জাতি বিভাগ, শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় বিবরণ রহিয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই শ্রেণীগুলির মধ্যে যে ছাত্র যে শ্রেণীটী গ্রহণ করিবে, সেই শ্রেণীতেই তাহাকে অপর চারিটী প্রশ্নপত্র লইতে হইবে। এই প্রকারে সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য ও বিশেষজ্ঞানলাভের জন্য ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। এতদ্ দ্বারা ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল কিনা, পাঠকগণই ভাবিয়া দেখিবেন।

এতদ্ব্যতীত, ইংরেজী সাহিত্য বিভাগ, ইংরাজী ইতিহাস বিভাগ, ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র ও গণিত বিভাগ রহিয়াছে। এই সকল বিভাগেও পূর্ব্বের ন্যায় আটখানা করিয়া প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রকার বৃহৎব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমরা উপরে যে কয়েকটী বিভাগের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা শক্তি আরো বহুমুখে প্রসৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিয়াছেন, ভারতের অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা নাই। প্রাচীন তিব্বতীয় ভাষায় ভারতের কত অমূল্য রত্ন ভাষান্তরিত রহিয়াছে। সে গুলির সংখ্যা কম নহে। সেগুলির উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার একান্ত উপযোগিতা রহিয়াছে। নতুবা সেই সকল মূল্যবান্ রত্নের আর পুনরুদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ভাষার শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থার নিমিত্ত, সার্ আশুতোষ কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়ে এবং গবর্ণমেণ্টের তিব্বতস্থ কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে সুপণ্ডিত কয়েকজন "লামা"কে লইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহাদিগের যোগে তিব্বতীয় অভিধান প্রস্তুতের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মুসলমানযুগের প্রাক্‌কালে, ভারতের অসংখ্য "বিহার" হইতে কত কত সুপণ্ডিত,—শিষ্যবর্গ লইয়া বহুযত্নে

অধীত ও লিখিত গ্রন্থসমূহ লইয়া, এই তিব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যার অন্ত নাই। তারপর বৌদ্ধযুগে,—এমন কি পালরাজগণের শাসনকাল পর্য্যন্তও, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত ছিল, পরস্পর গ্রন্থাদির বিনিময় হইত; কত গ্রন্থ এই প্রকারে তিব্বতে চলিয়া গিয়াছে। তথায় কতক বা মূলের আকারে, কতক বা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই দেশেই পড়িয়া রহিয়াছে। সার আশুতোষের এই যত্নের ফলে, এই সকল গ্রন্থরত্নের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা জন্মিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, ছাত্রবর্গ যাহাতে বাঙ্গালাভাষা, হিন্দীভাষা, আসামীভাষা এবং ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা উপযুক্তরূপে শিখিতে পারে, তজ্জন্য যে প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে সম্যক্ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালাভাষা ত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রণালীতে সুসংগত হইয়া, এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ফলে, বৎসরের পর বৎসর, ছাত্রবর্গ সুশিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছে,—এজন্য সমগ্র বঙ্গদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালাদেশেরই সম্পত্তি। বাঙ্গালী জাতির বিশেষ উপকারের জন্যই ইহা আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গালার নর-নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আপন সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার জন্য যে মহান্ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন,—সেই গুরুতর ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশার অতিরিক্তরূপে উদ্‌যাপিত করিতে পারিতেছেন কিনা, পাঠকবর্গ সেইটি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। সার্ আশুতোষ ইহার প্রধান কাণ্ডারী। সেনেটের সভ্যবর্গ তাঁহার সাহায্যকারী। ইঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে শিক্ষার প্রণালী যাহা অবলম্বিত হইয়াছে, ইহার প্রশংসা একমুখে করিতে পারা যায় না।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গত পিতাপুত্র।

স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম "নব্যভারত" প্রকাশের সময়েই (১২৯০ সালে) সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করি। তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তবে পত্রিকাদি পড়িবার বাতিক খুবই ছিল, "নব্যভারত" খানি শ্রদ্ধাসহ পাঠ করিতাম।

দেবীপ্রসন্নবাবু তখন উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "শরচ্চন্দ্র" "বিরাজমোহন" প্রভৃতি অনেক গুলি উপন্যাস তিনি লিখিয়াছিলেন। সেই গুলির কয়েক খানি "নব্যভারতে" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের ছাড়া অপরের উপন্যাসও "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল যথা ৺রমেশচন্দ্র দত্তের সংসার ও সমাজ। পরিশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে গল্প ও উপন্যাস ভূয়িষ্ঠ ভাবে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা গুলি অধিকার করিয়া সৎসাহিত্যের ক্ষতি জন্মাইতেছে তখন তাঁহার "নব্যভারতে" গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করা রহিত করিয়া দিলেন।

ইহাতে "নব্যভারতে" গ্রাহক সংখ্যার নিশ্চয়ই আশানুরূপ বৃদ্ধি হইতে পারে নাই কিন্তু দেবীপ্রসন্ন বাবু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ও করেন নাই। অপিচ চিত্র দ্বারা পত্রিকা সুশোভিত করিয়া ইহার আকর্ষণী শক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ও দেবীপ্রসন্ন বাবু কদাপি যত্ন করেন নাই। তিনি ইহাতে বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়াই বোধহয় মনে করিতেন। ঐ হেতু তিনি গন্ধ তৈলের বিজ্ঞাপন, তথা চকচকে "প্রচ্ছদ পট" ইত্যাদিরও পক্ষপাতি ছিলেন না তাঁহার পত্রিকায় এসকল দেখা যায় নাই। ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্র কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর লেখায় একটা বিশিষ্টতা ছিল ইহাতে তাঁহার আন্তরিকতা (আর্ণেষ্টনেস্) প্রতিভাত হইত। এই গুলি পাঠ করিলে তাঁহার গভীর দেশবাৎসল্য, সমুদার নীতিজ্ঞতা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যাইত। আজকালকার উপন্যাস গুলিকে অনেকটা "কামানলের ইন্ধন" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন বাবুর উপন্যাসগুলি তাদৃশ ছিলনা ঐগুলি পাঠ করিলে সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফললাভই হইত। পরন্তু আজকাল, সে সব পড়িবার লোক বিরল। রুচি বদলিয়া গিয়াছে তাই বোধহয় তিনি ও পথে আর যান নাই। ফলতঃ লোকসাধারণের রুচির অনুবর্ত্তনে যা' তা' লিখিয়া অথবা যা' তা' করিয়া পয়সা কুড়ান দেবী-প্রসন্ন বাবুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই জন্য তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

তাঁহার আর একটি গুণ ছিল নির্ভীক নিরপেক্ষতা ; তাঁহার "নব্যভারত" দলবিশেষের কাগজ ছিলনা। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন তথাপি সম্প্রদায়ের গলদ ঘাঁটিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মোসমাজ" প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার প্রতি অপক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধার ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। "সত্যের" অনুরোধে এবং বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কেহ কেহ পত্রিকা সম্পাদক ভাবে পৈতৃক সমাজের দোষোদ্ঘাটনে পঞ্চমুখ, পরন্তু নিজের সমাজের গলদ দেখিতে 'পরাঙ্মুখ' হইয়া থাকেন। প্রকৃত সত্যান্বেষী বিবেকবান্ ব্যক্তি তাহা করেন না দেবীপ্রসন্ন বাবু সেইরূপ একজন ছিলেন। যে গলদ ঘাটিবে, তাহার উপর অনেকেই রুষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক, সেই রোষের ভয় করিয়া প্রকৃত সমাজ হিতৈষী ন্যায়বান্ ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হন না ; দেবীপ্রসন্ন বাবু তাদৃশ নির্ভীক ছিলেন।

এই সকল কারণে, আমি দেবীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষপাতী ছিলাম, এবং "নব্যভারতে" মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ দিতাম।*

সর্ব্বপ্রথম বোধহয় ১৩১৪ সালে "নব্যভারতে" প্রথম প্রবন্ধ (পরমহংস শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দপুরী) প্রেরণ করি। প্রবন্ধলেখক রূপে "নব্যভারত" পত্রের অন্ততঃ ঐ সংখ্যা বিনামূল্যে পাইতে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দেবীপ্রসন্ন বাবু বোধ হয় যে সে লেখককে বিনামূল্যে পত্রিকা দিতেন না। তাই মূল্য দিয়া ঐ সংখ্যার "নব্যভারত" (২৫শ খণ্ড ৯।১০ম সংখ্যা) ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন বলিতে পারি, যে ইহাতে আমি তখন একটু অসন্তুষ্ট হইয়া

---

* এরূপ কৈফিয়ৎ দিবার একটু কারণও আছে। সাহিত্য-সমাজপতি স্বর্গীয় সুহৃৎ সুরেশচন্দ্রের পত্র বিশেষ হইতে নিম্নোদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই কারণ প্রতীত হইবে।

"আশা করি আপনি ভাল আছেন, এবং গোঁড়ামীতে গোঁড়া লেবু অপেক্ষাও টক্ হইয়া ব্রাহ্মলুমের পাহাড়ে প্রবন্ধ নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

ছিলাম; কিন্তু পশ্চাৎ ঐভাব দূরীভূত হয়, এ যাবৎ বৎসরে এক দুইটা প্রবন্ধ "নব্যভারতে" দিয়া আসিতেছি এবং ইদানীং "নব্যভারত" নিয়মিত রূপেই প্রাপ্ত হইতেছি।

বোধহয় ১৩১৫ সালে যেবার রাজসাহীতে সাহিত্য সম্মিলন হয় দেবীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার অমায়িক ও প্রীতিপ্রদ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং সাহিত্যসম্মিলন সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রবন্ধ "নব্যভারতে"ই দিব, এরূপ একটা সংকল্প ধার্য্য করিয়াছিলাম। দেবী-প্রসন্ন বাবুর আমোলে এই সংকল্প হইতে কদাপি বিচ্যুত হই নাই এবং তাঁহার স্বর্গতির পরে এ যাবৎ সাহিত্য সম্মিলনও আর হয় নাই।

এই উপলক্ষ্যে দেবীপ্রসন্ন বাবুর উদ্দেশে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আবশ্যক মনে করিতেছি। ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এমন দুএকটি কথা ছিল যাহা প্রকাশ করাতে দেবীপ্রসন্নবাবুর সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের নিকটে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি কোনও কিছু বাদ দিয়া প্রবন্ধের অঙ্গহানি তথা প্রবন্ধ লেখকের মনোব্যথা ঘটান নাই। বাঁকিপুর সাহিত্যসম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধে মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের স্তাবকবর্গের উক্তির প্রতিবাদে এবং পশ্চাৎ আরো দুএকটি প্রবন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা দেবীপ্রসন্ন বাবু অকুতোভয়ে যথাযথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য দুএক জন পত্রিকা সম্পাদকের হাতে এতাদৃশ প্রবন্ধের কি গতি হইত, তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা সূচিত করিতেছি। "বাঁকীপুর সাহিত্যসম্মিলন" প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ প্রবাসী পত্রিকায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে।" এই শিরোনামে "কষ্টি পাথর শীর্ষক পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছিল। জনৈক পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া "কষ্টি পাথরে বাজে দাগ" নামক প্রবন্ধ লিখেন, ইহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ইত্যাদি যথেষ্ট ছিল। প্রতিবাদী এই প্রবন্ধ 'প্রবাসীতে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই 'ব' 'ভ' ও 'ম' এই তিন পত্রিকায় ও পাঠান। 'ব' ও 'ম' সম্পাদক সমগ্র প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন এবং "ভ" সম্পাদক ইহার সারসংক্ষেপ সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশিত করেন। প্রতিবাদের উত্তরে প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম' "প্রবাসী" অবশ্যই তাহা ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু 'ব' ও 'ম' এর নিকট ঐ উত্তরের প্রতিলিপি প্রেরিত হইলেও 'ব' সম্পাদক কৃপা করিয়া অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রকাশ করেন, "ম" সম্পাদক ইহা প্রকাশের উপযুক্তই মনে করেন নাই। "ভ" সম্পাদকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরের চুম্বক প্রেরিত হইলেও, তিনি তাহা না ছাপাইয়া কতকগুলি বাজে কথা বলিয়া তর্কবিতর্কের উপসংহার করেন। দেবীপ্রসন্ন বাবু কদাপি লাভ লোকশানের আশায় সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।

একদিন ভিন্ন দেবীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পর আলাপাদি হয় নাই। কিন্তু পত্রালাপ যথেষ্ট হইত—দুঃখের বিষয় ঐ সকল পত্র (দৈবাৎ একখানি ব্যতীত) সংরক্ষিত হয় নাই। আত্মীয় ভাবেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন ১৩২০ সালে কোনও লেখার * জন্য একটা ডিফেমেসন মামলা এখানে (গৌহাটিতে) দায়ের হয়, তখন এই

* ইতোঽধিক অপর কোনও পত্রিকায় পাঠাইয়া ছিলেন কিনা জানি না ঐ তিন খানিই আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল।

"ত্রিশ বৎসর অন্তে" শীর্ষক প্রবন্ধে ৺ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর ৺ কামাখ্যা তীর্থ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য উপলক্ষে ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে ইহাতে দু একটা অপ্রীতিকর কথা ছিল।

সহরে তাঁহার স্বজেলার পরিচিত অনেকে থাকিলেও আমাকেই সাহায্যার্থ লিখেন—সুখের বিষয় মাম্‌লাটা আপোষে মিটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে চিঠিখানি আছে তাহা ঐ মাম্‌লা সম্পর্কিত—এবং গোপনীয় বলিয়া পরিচিহ্নিত—তাই এই স্থলে প্রকাশ করা গেল না।

তাঁহার পুত্র অচির স্বর্গত প্রভাতকুসুম বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই—তবে পত্রালাপ আরম্ভমাত্র হইয়াছিল। প্রভাতকুসুম সাধু মাতাপিতার * সন্তান—সাধুই ছিলেন—নানা সৎকর্ম্মে তাঁহার উৎসাহের কথাও শুনিয়াছিলাম। বাল্যে বিলাত গিয়া তিনি পিতাকে যে সকল চিঠি পত্র দিতেন—বোধ হয় তাহাই "খোকার বিলাতের পত্র" এই শিরোনামে "নব্যভারতের" অঙ্গীভূত হইয়া প্রভাতকুসুমের সাহিত্য সাধনায় হাতে খড়ি হইয়াছিল। পরন্তু পিতা জীবিত থাকিতে কৃতবিদ্য পুত্র প্রভাতকুসুম 'নব্যভারতের' কোনও রূপ সেবা করেন নাই—এবং দেবীপ্রসন্ন বাবু কোনও এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে পুত্রের এ দিকে তেমন মতিগতি নাই। পিতার মৃত্যুর পরে যখন প্রভাতকুসুমকে 'নব্যভারতে'র পরিচর্য্যায় ব্রত হইতে দেখিলাম—পত্রিকাখানির সৌষ্ঠবার্থে সচেষ্ট দেখিলাম—তখন প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছিলাম। ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ † 'নব্যভারতে' পাঠাইয়া প্রভাতকুসুম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—প্রবন্ধটি তাঁহার মনঃপূত হইয়াছে কি না—কেন না, তাহাতে এমন দুএকটি কথা ছিল যাহা তদীয় সাম্প্রদায়িক অভিরুচির বিরোধী বিবেচিত হইতে পারে। তদুত্তরে লিখিত তাঁহার এই শেষ পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতে দেখা যাইবে, তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন।

"আপনার স্নেহ পত্র ও ৺ ভূদেব স্মৃতি শীর্ষক প্রবন্ধটি পাইয়া যারপর নাই উপকৃত হইলাম। আপনি এই প্রকার মধ্যে মধ্যে 'নব্যভারতের' প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিলে কৃতার্থ হইব। আপনার সন্দর্ভের সহিত যদি সকলের মতের মিল নাও হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? আপনি নির্ভীক ভাবে যেমন আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ত্রুটি করিবার কোন নূতন কারণ উপস্থিত হইয়াছে না ভাবিলেই সুখী হইব।

'নব্যভারতে' যে চিরপ্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই সার্ব্বভৌম নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে আমি যতদিন ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি, প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করিব না। প্রতিবাদও ছাপিব। এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আশঙ্কাও দেখি নাই।"

পত্রখানি পাইয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে উত্তর লিখি, তাহা বোধ হয় প্রভাতকুসুম রোগশয্যায় পাইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরেই হঠাৎ শুনা গেল তিনি অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* পিতা দেবীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে যথোচিত বলিয়াছি—মাতার সম্বন্ধেও আমার বাল্যাবধি একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। জনৈক ব্রাহ্ম বাল্যবন্ধু শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় গিয়া দেবীপ্রসন্ন বাবুর আশ্রয়ে অবস্থান করেন—তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'Devi Babu's wife is an incarnation of piety" ঐ কথাটা তদবধি স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকিয়া আমাকে দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীর প্রতিও শ্রদ্ধালু করিয়াছিল।

† নব্যভারত ১৩২৮ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের ৺ ভূদেব স্মৃতিসভায় পঠিত প্রবন্ধ "উপাসনা" পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল দুঃখের বিষয় তাহাতো প্রকাশিত হয়ই নাই প্রবন্ধটা ফেরত চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই। তবে এডুকেশন গেজেটে ঐ প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক।

মহাভারত মঞ্জরী।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্বিতীয়বার পাশাখেলা।

পাণ্ডবেরা স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে দুর্য্যোধনাদির দুঃখের অবধি নাই। তাঁহারা আবার পরামর্শ করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। পরে দুর্য্যোধন পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, "রাজন, পাণ্ডবেরা কি এই অপমান জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিবে? দ্রৌপদীর এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ কি আমাদের রক্ত বিনা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে? আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহা কি সম্ভবপর। আপনি শীঘ্রই শুনিবেন, তাহারা বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, ভীষণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। তখন কি করিবেন! কিরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই জন্য বলিতেছি, তাহাদিগকে পুনবার পাশা খেলিতে আহ্বান করুন। এবার যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি চর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিবেন। চিনিতে পারিলে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। এইরূপ পণে পরাজিত করিয়া, বুদ্ধিবলেই কণ্টকোদ্ধার করিব। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরাও বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিব। হে ধীমান, আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া আমাদিগকে বিপদ সাগরে ভাসাইবেন না।"

অন্ধরাজ সম্মত হইলেন। তাহা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদ্বয় বিকর্ণ ও যুযুৎসু প্রভৃতি সভাস্থিত অনেকেই প্রতিবাদ করিলেন। শেষে গান্ধারী দেবী আসিয়া বলিলেন, "রাজন্ যখন, দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখনই বিদুর বলিয়াছিল, 'এই পুত্র বংশ-নাশ করিবে।' তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? ধর্ম্মাত্মা বিদুরের কথা কখনও মিথ্যা হইবার নহে। অতএব দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া এই বৃহৎ বংশ রক্ষা কর। হায়! কে পাণ্ডবগণকে উত্তেজিত করিতে সাহস করে! কে নির্ব্বাপিত অনল পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ হইতে চায়। অন্যায় উপায় দ্বারা ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিলেও তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না।"

অন্ধরাজ উত্তর করিলেন, "দেবী, যদি বংশ নাশ অবশ্য ঘটিবার হয়, তবে কে তাহা নিবারণ করিবে? দুর্য্যোধনেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, আমি কি করিব?"

পাণ্ডবেরা রথে চড়িয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় দূত গিয়া উপস্থিত হইল, "বৃদ্ধ রাজা পুনরায় পাশা খেলিতে আহ্বান করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কি করিব, জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ। আমার সর্ব্বনাশ হইলেও তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিব না।"

সকলে শকুনির প্রবঞ্চনা জানিয়া শুনিয়া আবার হস্তিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবার সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। ধূর্ত্ত শকুনি আবার পাশা খেলিতে যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান

করিল। পণের নিয়ম জানাইল। অবিলম্বে খেলা আরম্ভ হইল। ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই বসিয়া রহিলেন। শকুনি পাশা নিক্ষেপ করিল আর বলিল, "এই আমার জিত", আর অমনি জয়ী হইল। অমনি তাহারা পাণ্ডবগণকে সত্য পালন করিতে বলিল। অমনি অজিন আনীত হইল। পাণ্ডবেরা রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, "তুমি এই দীন হীন পাণ্ডবগণের সহিত বনে গিয়া কি সুখ পাইবে। কৌরবগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বরণ কর।" সে ভীমকে "গরু গরু" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল, আর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দুর্যোধন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, ভীমের গতির অনুকরণ ছলে ত্রিভঙ্গ হইয়া গমন করিতে লাগিল, আর বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভীম তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা এই, ত্রয়োদশ বর্ষ পরে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব, তাহার মস্তকে পদাঘাত করিব। দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব।"

বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তোমার জননী বৃদ্ধ হইয়াছেন, বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে আমার গৃহে রাখিয়া যাও," তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু কুন্তী দেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, পুত্রগণের সহিত বনে যাইতে জেদ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

বিদুর সেই সভায় পাণ্ডবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পুত্রগণ, কেহ অন্যায় রূপে পরাজিত হইলে দুঃখিত হয় না। তোমরা কোন অবস্থাতেই নিরানন্দ, নিরুৎসাহ হইও না। কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য করিতে ভুলিও না। মনে রাখিবে, যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়।"

রাজা যুধিষ্ঠির তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা আজ পিতামহ, আচার্য্য, জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃব্য, দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ সকলের নিকটেই বিদায় লইতেছি। আবার দেখা হইবে।"

তখন পাণ্ডবেরা বনবাসে বহির্গত হইলেন। আর দ্রৌপদী? অশেষ দুঃখ দুর্গতির মধ্যেও যদি স্বামীগণকে সুস্থ ও সুখী করিতে পারেন, এই আশায় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নগরবাসীরা তাঁহাদের জন্য অশ্রুপাত ও ধৃতরাষ্ট্রাদির বহু নিন্দা করিতে করিতে বহুদূর অনুগমন করিল। পরে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ফিরিয়া আসিল।

পাণ্ডবেরা প্রস্থান করিলে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাণ্ডবগণকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন সমুদয় ভারতবর্ষের একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন, এখন পুত্র পৌত্রগণের সহিত আনন্দ করুন।" কিছুকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "হায়, আপনি আজ পাপ পুত্রের কথায় যে কীর্ত্তি করিলেন, তাহার পরিণামে সমুদয় ভারতবর্ষ উৎসন্ন হইবে।"

বিদুর বলিলেন, "হায়! দুর্যোধন আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিল, তাহার ফল চতুর্দ্দশ বর্ষে ভোগ করিবে।" কিছুকাল নীরব থাকিয়া পরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "রাজন্, সকলেরই চক্ষু আছে, তবে লোকে কাহাকেও দূরদর্শী, কাহাকেও অদূরদর্শী বলে কেন?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পাখীর কথা—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি এল প্রণীত হৃষীকেশ সিরিজ, নং ২। খুব ভাল কাগজে ছাপা। ২৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ভাল কাপড়ের মলাটে বাঁধা, ও সোণার জলে নাম ছাপা। বইখানিতে কয়েকখানা ভাল ছবি আছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর বই এই নূতন, এই নূতনত্বের জন্যও বটে, আর গ্রন্থের গুণের জন্যও বটে, এখানির বিশেষ সমালোচনা প্রয়োজন। গ্রন্থের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কলিকাতার লাহা মহাশয়েরা ধনী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ; ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। সে কালের বড়মানুষেরা শুধু আপনাদের খেয়ালে পাখী পুষিতেন আর বুলবুলের লড়াই-এর জন্য অনেক ব্যয় করিতেন। কৃতবিদ্য গ্রন্থকার পাখী পুষিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নিবিষ্ট। এই বংশের আর একজন কৃতী যুবক, অর্থশাস্ত্র, পুরাতত্ব, প্রভৃতির আলোচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শুভদিন আসিয়াছে।

গ্রন্থখানির দোষের অংশ চাঁদের কিরণে কলঙ্কের মত ডুবিয়া গিয়াছে; তবে এ শ্রেণীর বই নূতন বলিয়া, আর ভবিষ্যতে সুযোগ্য লেখক দোষটুকুর দিকে তাকাইবেন মনে করিয়া, প্রথম ক্ষুদ্র দোষের কথাই বলিতেছি। এ শ্রেণীর বইয়ের ভাষা, সরস হওয়া উচিত; খাঁটি বিজ্ঞানে হউক আর বৈজ্ঞানিক বর্ণনাতেই হউক, সরল ভাষায় বই রচনা করাই ইউরোপের পদ্ধতি। সৌন্দর্য্যের বর্ণনাতেও সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগে বর্ণনা মনোরম হয় না, পদ-যোজনাটা কোন রচনাতেই জটিল করা চলে না। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিতেছেন,—"এইবার পথিমধ্যে গৃহবলভিতে সুপ্ত পারাবত ও অম্বোবিন্দুগ্রহণ-চতুর চাতকের উপর কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোকরশ্মি নিপাতিত করিয়া সঞ্চরমান মেঘদূতকে অলকার পথে বিদায় দিয়া, আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।" এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, আশা করি, গ্রন্থকার তাহার রচনারীতিকে আদর্শ করিবেন।

গ্রন্থকার নিজে নানা জাতীয় পাখী পুষিয়াছেন, পাখীর বাগান করিয়াছেন, আর বৈজ্ঞানিকের চোখে পাখীদের গতিবিধি দেখিয়া, পাখীতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। পাখী সম্বন্ধে এমন বই নাই যাহা তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়েন নাই, আর নিজের পরীক্ষায় বিদেশীদের পরীক্ষাকে পদে পদে যাচাই করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কোথায় কোন পাখীর কেমন বর্ণনা আছে, তাহা বিজ্ঞানের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া প্রাচীন পাখীদের নামের চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। একটা বিষয় লইয়া এমন করিয়া না মজিলে, কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ভবিষ্যতেও গ্রন্থকারের কাছে আমরা অনেক আশা করি।

চকা-চকীর বিরহ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা লইয়া গ্রন্থকার অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি নিজে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। শীতকালে ওড়িষ্যার মহানদীর পাহাড়ে অংশে অনেক ছোট ছোট বালির চড়া পড়ে, আর চড়ায় চড়ায় নানা পক্ষী রাত্রে বাস করে; একজোড়া চকা-চকী একটা চড়ায় ও আর একজোড়া আর একটি কাছের

চড়ায় বসিয়াছে, তাহা সন্ধ্যার সময়ই লক্ষ্য করিয়াছি; রাত্রে যখন, দুটি চড়া থেকেই চকাদের ডাক শুনিয়াছি, তখন মনে হইয়াছে, যে এক চড়ায় পুরুষ চকা ডাকিয়া উঠিলেই, অন্য চড়ায় চকাটি সাড়া দিয়া ডাকে। এপারে ওপারের এই রকম ডাক শুনিয়াই হয়ত কবি কল্পনার সৃষ্টি। দীর্ঘরবে ডাকে চকারা, আর চকীরা সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাকের তাল রাখিয়া যে "কোঁ কোঁ" করে তাহা হয়ত বৈজ্ঞানিকেরা সহজে বুঝিবেন, কারণ, পাখাদের মধ্যে পুরুষগুলিই কণ্ঠস্বরের খেলা বেশী দেখায়। গ্রন্থকার আমার কথাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আমরা আনন্দে ও আগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, যে পাঠকেরা এই গ্রন্থখানি পড়িবেন।

ঝড়ের দোলা—৮৮ বি হাজরা রোড হইতে ফোর আর্টস ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৴০ বার আনা। ছাপা ও কাগজ ভাল। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

এই বইখানিতে চারিটি গল্প আছে। (১) 'পাগল' শ্রীসুনীতি দেবী কর্তৃক লিখিত; (২) 'মাধুরী' শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ কর্তৃক রচিত; (৩) 'শিপতি'—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর রচনা; 'জয়মালা'র রচয়িতা শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

ছোট ছোট গল্পের এই বইখানি, একদিকে গল্পগুলির মধুরতায়, আর অন্যদিকে রচনার সুকৌশলে, মনোহর হইয়াছে। রচনা-কৌশলের একটু নূতনত্ব এই, যে সাজাইয়া গুজাইয়া গোড়া বাঁধিয়া, গল্পের আখ্যান আরম্ভ করা হয় নাই, তবুও প্রথম ছত্র পড়িবা মাত্রেই গল্পের রস অনুভব করা যায়। ছোট গল্পের পক্ষে এই কৌশল বড় প্রশস্ত। লেখাগুলিতে কোথাও বাজে কথার বোঝ নাই, অথবা একটা বর্ণনার নামে কথা ফুলান নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুই চারিটি কথা।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে অসহযোগীদের ভীতিপ্রদর্শনের ফলেই ১৭ই নবেম্বর হরতাল হইয়াছিল। এবং সেই ভীতি জনসাধারণের মন হইতে আপনোদনের জন্য, সরকার সভাসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়া শান্তিপ্রিয় ও ভদ্র সার্জ্জেণ্ট ও গোরাদিগকে রাস্তায় রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিলেন। মনে রাখা উচিত যে স্বেচ্ছাসেবকেরাই নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চাঁদপুরে বিসূচিকাগ্রস্ত কুলীদিগের মধ্যে কাজ করিয়াছিল! এই সকল বীরহৃদয় পরদুঃখকাতর যুবকদের সৎকর্ম্মগুলি একেবারে উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে গুণ্ডার সামিল করিয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে আপনাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে জন্য অত্যন্ত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত পুলিশ তাহাদিগকে সরকারী-গৃহে স্থান দিতে লাগিল। এই নম্রতার চরম হইল হেরম্ব বাবুর সহিত গোরাপল্টনের ব্যবহারে! সে কথা যাউক, কিন্তু ১৭ই তারিখের হরতালের সহিত ২৪শে ডিসেম্বরের তুলনা কোথায়? পূর্ব্ব তারিখে গাড়ী বন্ধ, দোকান হাট বন্ধ, রাস্তায় আলোর অভাব। ২৪শে তারিখেও তাহাই, অথচ ১৭ই তারিখে স্বেচ্ছাসেবকগণ বাহির হইয়াছিল, ২৪শে তারিখে স্বেচ্ছাসেবক বাহির হয় নাই। এই পার্থক্যটি মনে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ১৭ই তারিখে যুবরাজ কলিকাতায় আসেন নাই, ২৪শে তারিখে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পূর্ব্বে যুবরাজের পিতা যখন আসিয়াছিলেন, তখন পুলিশের রুলের গুঁতা ও গোরার চাবুক খাইয়াও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ব্যগ্র হইত। এবার কয় সহস্র

লোক গিয়াছিল? হরতাল শুধু কলিকাতায় হয় নাই সমগ্র বঙ্গদেশময় হইয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে যে, অসহযোগীগণ দলে কমই হউন বা বেশীই হউন সাধারণ লোকে তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিতে ইচ্ছুক—তাঁহারা ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন। বুঝা যাইতেছে যে সরকারের প্রতি সাধারণের আর শ্রদ্ধা নাই। গত এক বৎসরের মধ্যে চাঁদপুরের ঘটনা, দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ও ১০৮ প্রভৃতি ধারায় গবর্ণমেণ্ট ন্যায় বিচারের নামে যে অবিচার করিয়াছেন তাহার ফলেই লোকের মন এরূপ বিমুখ হইয়া উঠে নাই কি? বিশিষ্ট, পরোপকারী, শিক্ষিত ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ নানা অজুহাতে অত্যাচারিত ও জেলে প্রেরিত হইয়াছেন। তাহার ফলে লোকের মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন না। সরকার যেন ভুলিয়া না যান যে যদিও দেশের সকলেই এখনও অসহযোগী নহে, তাহাদের মন অসহযোগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ও এইরূপ দমননীতি চালাইতে থাকিলে সকলেরই অসহযোগী হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় সমগ্র বাঙ্গালার প্রতিনিধি হইয়া গোরার আক্রমণের প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলেন। গোরা তাঁহাকে অপমান করিয়া শুধু তাহাকেই নহে সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে অপমানিত করিয়াছে। হেরম্ব বাবুকে লাট সাহেব বলিয়াছেন, "আর এরূপ ঘটিবেনা!" আর কি ঘটিবে না? হেরম্ব বাবুর প্রতি অপমান, না সমস্ত দেশবাসীর প্রতি অপমান? এবিষয়ে হেরম্ব বাবু নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছেন কি? পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহে এই আশ্বাসের মূল্য রহিয়াছে কি?

তাহার পর সার হেনরী হুইলার যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। অসহযোগীগণ প্রহারের বদলে প্রহার দিবে না জানিয়াই গোরাপল্টন বীরত্ব প্রকাশ করিতে সাহসী হয়। ইংরাজী মুখপত্র "ইংলিশম্যান" বলেন "The military were chasing peaceful citizens" এবং ইহার বিরুদ্ধেই মৈত্র মহাশয় প্রতিবাদ করেন। হুইলার সাহেব নাকি আভাস দিয়াছেন যে বিলাতে ঐরূপ করিলে মৈত্র মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইতে পারিত, জিজ্ঞাসা করি, বিলাতে মিলিটারী ঐরূপ করিতে সাহস পাইত কি? আর যদি করিত এবং যদি মৈত্র মহাশয়ের মত পদস্থব্যক্তি ঐরূপে অপমানিত হইতেন তাহা হইলে বিলাতের "mob" কি করিত? কি করিত তাহা আমরাও জানি, সার হেনরীও জানেন।

এবার কংগ্রেসের বিবরণ পড়িলে দেখা যায় যে অন্যান্য বৎসর হইতে এবার কংগ্রেসে কথার ধূম কম। বক্তৃতা অপেক্ষা কার্য্যের প্রতি সভ্যগণ বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। কংগ্রেস হজরত মহানীর প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া, কংগ্রেসের স্বরাজের ক্রীড্ (creed) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভালই করিয়াছেন। দেশের লোককে যে কাজের জন্য আহ্বান করা হইবে, সে কাজের জন্য সমগ্র জনসঙ্ঘ প্রস্তুত না হইলে, কেবল বিপদ ডাকিয়া আনা হয়, উদ্দেশ্য সফল হয় না। কংগ্রেস হইতে এবার দেশের সর্ব্বসাধারণকে, সকল রকম মতাবলম্বীকেই দেশের কাজে আহ্বান করা হইয়াছে। লক্ষ্য যখন এক, তখন কার্য্য পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য ভুলিয়া একত্র কাজ করিবার সুযোগ সকলকে দান করিয়া কংগ্রেস বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে সরকারের বিফল চেষ্টায় ফল দাড়াইয়াছে এই যে, বিভিন্ন পন্থীদের মতের পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া সকলে একযোগে কাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার আভাস আমরা নরমপন্থীদের এলাহাবাদে বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির বক্তৃতায় পাইতেছি। বেতাল।

স্বরাজ।

(২৪)

কোনও রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী,—কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পুরুষ, কি স্ত্রী,—সকলে তথায় তাহাদের রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সম্যক বিকাশের সুযোগ পাইবে ইহা সুনিশ্চিত হইলে, তবে বলা চলে যে সে রাষ্ট্রের লোক স্বয়ং-শাসনের (Self-government) অভিমুখে যাইবার জন্য প্রশস্ত সুগম পথে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অরাজক সমাজের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে যাঁহারা সাম্যবাদী অথচ শাসন-মূলক রাষ্ট্র (State) চাহেন না, যাঁহারা শক্তিমূলক শাসন (Government) চাহেন না, যাহারা বলেন যে কোনও দেশে মানব সমাজে তথাকার জনসমষ্টির মতের প্রাধান্য থাকিবে না কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে স্বীয় স্বীয় বিবেকের আধিপত্য থাকিবে, তাঁহাদের মতে সমাজ গঠিত হইলে সে সমাজে পৃথক্ সম্পত্তি (Private Property) থাকিবে না, মূলধন বা সুদ থাকিবে না, উত্তরাধিকার (Inheritance) থাকিবে না, বিচারালয় থাকিবে না, কারাগার থাকিবে না, পুলিস বা সৈন্য থাকিবে না। সে সমাজে অধিকার বা দায়িত্ব নির্দ্দেশ ব্যাপার খুব সহজ হইয়া পড়িবে। অধিকার বা দায়িত্ব মানাইবার জন্য শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন থাকিবে না। তাঁহাদের মতে, স্বরাজ বলিতে অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন বুঝাইবে না, স্বরাজের অর্থ সর্ব্ববাদীসম্মত শাসন বা সমাজে শাসনের অভাব। মানব সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও দেশে এরূপ স্বরাজ সম্ভব নহে বলিয়া, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র চালাইতে হইবে ইহা মানিয়া লইয়া, আমাদের রাষ্ট্রে সকল লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের আয়োজন কতদূর করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

শাসন নীতি নির্দ্দেশের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শুনিয়াছি যে মূলতঃ শাসন নীতি নির্দ্দেশ ব্যাপারটী অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশ। এক রাষ্ট্রের ভিতরে রামের অধিকার ও শ্যামের দায়িত্ব স্থির করিতে হয়। এক শ্রেণীর অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া অপর শ্রেণীর দায়িত্ব স্থির করিয়া দিতে হয়, যেমন প্রজা ভূম্যধিকারীর বা উত্তমর্ণ অধমর্ণের অধিকার বা দায়িত্ব। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, যে শ্রেণীর দায়িত্ব আছে তাহারই আবার অবস্থা বিশেষে অধিকার আছে, নতুবা রাষ্ট্র টেঁকেনা। এখানেও কিস্তির পর কিস্তি; আবার পাল্টা কিস্তির ব্যবস্থা (Check and balance system)। এই যেমন বলিলাম একই রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশের কথা; তেমনই আবার এক রাষ্ট্র ও অপর রাষ্ট্র, এ দুইয়ের ভিতরেও অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশের জটিল ব্যাপার রহিয়াছে। এক রাষ্ট্রের যাহা অধিকার (Rights) তাহা অপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব (Dutes)। আবার দায়ী রাষ্ট্রেরও অধিকার আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র সকলের পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় আপোষে আলোচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হয়। অধিকার স্থির করিবার সময় আপোষে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে, ফলম্ রণম্। অনেক সময় ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পরের

মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব স্থির নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তবুও সে নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে এক রাষ্ট্র নারাজ ও সেই জন্য দুই রাষ্ট্রে রণ বাধিয়াছে। রণে নিযুক্ত রাষ্ট্র সমূহের রণসম্পর্কে পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করিতে হয়। আবার রাষ্ট্রগুলি যখন পরস্পর বন্ধুভাবে শান্তিতে বাস করে তখনও উপনিবেশ বা সীমান্ত প্রদেশের লোক বা জমি, আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধায়োজন, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্র সমূহের অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করিতে হয়। এই যে সব অধিকার বা দায়িত্ব নির্দ্দেশের কথা বলিলাম, হহা লইয়াই ব্যবহার বা আইন।

প্রাচীন কালে একসময়ে যাহা ছিল প্রথা (custom) পরে তাহা হইল ব্যবহার বা আইন (Law)। ব্যবহার বা আইন মানাইবার জন্য রাষ্ট্রের শাসন। প্রথা মানাইবার জন্যও সমাজের শাসন ছিল। কোনও প্রথা আমাদের দেশে কে প্রথমে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। প্রথার স্রষ্টি কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক ও যাহারা প্রথা মানিয়া চলে বা না মানিবার দরুণ সমাজে শাস্তি পায়, ইহারা সমসাময়িক নহে। প্রথা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যগণ প্রধানতঃ নিজেদের সমাজের প্রাচীন প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলিতেন। সেই প্রথানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব তাঁহারা মানিতেন। আবার অনার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা আর্য্য প্রথা হইতে ভিন্ন হইলেও, এমন কি অনার্য্য প্রথাগুলিকে হেয় জ্ঞান করিলেও, কালক্রমে আর্য্যগণ অনেক অনার্য্য প্রথা আর্য্যসমাজে প্রচলিত করিয়া নিয়াছিলেন। আর বিজিত অনার্য্যগণ কালক্রমে বিজেতা পরিবর্ত্তিত আর্য্যদিগের প্রথা নিজ সমাজে মানিয়া নিয়া আর্য্যসমাজের নিম্নতম শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইত। কিন্তু আর্য্যপ্রথাই বল, অনার্য্যপ্রথাই বল, যে জনসাধারণ এই সব প্রথা মানিয়া চলিত, বা না মানিবার দরুণ সমাজে শাস্তি পাইত, তাহাদের শতকরা নিরানব্বই জনের এই সব প্রথা স্রষ্টি বা প্রবর্ত্তন ব্যাপারে কোনও হাত ছিল না। তাহাদের অধিকার (rights) ও দায়িত্ব (duties) ঐ সকল প্রথানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইত বটে; কিন্তু সে অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশ ব্যাপারে তাহাদের মত বা অমতে বড় একটা আসিয়া যাইত না।

প্রাচীন প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন হইত না, এমন কথা বলিতেছিনা। কি পরিবর্ত্তন হইবে, পুরাতন প্রথা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজে নুতন আকারে প্রচলিত হইবে তাহা সে কালে কে স্থির করিয়া দিত? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোনও কোনও দেশে পুরোহিত দলপতি বা পুরোহিত-রাষ্ট্রপতি তাহা স্থির করিয়া দিতেন। কোনও কোনও দেশে বা দলপতি বা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে নায়ক-পিতৃগণ সকলে মিলিত হইয়া আলোচনা ও বিচারের পর তাহা স্থির করিয়া দিতেন। অপরাপর প্রাচীন দেশে যেমন, আমাদের দেশেও ধর্ম্ম বলিতে তখন মানুষের সমগ্র জীবনের প্রায় প্রত্যেক ব্যাপার বুঝাইত। আমাদের দেশে প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য প্রথা বা সদাচার তখন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ও অধীন ছিল। কালক্রমে নির্দ্দিষ্ট প্রথাগুলি আমাদের দেশে ধর্ম্মসূত্র ও পরে ধর্ম্মশাস্ত্র আকারে, শাস্ত্রালোচনার অধিকারী ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার বিচার করিবার অধিকার সকলের ছিল না।* তখনকার আর্য্যসমাজের বাহিরের বিজিত অনার্য্যগণের কথা ছাড়িয়া দিই; আর্য্যসমাজভুক্ত সর্ব্ব সাধারণের অতি ক্ষুদ্রাংশের সে অধিকার ছিল।

যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা আলোচনা করিবার অধিকারী ছিল না, তাহারা প্রথা পরিবর্ত্তনের কথাও বড় একটা তুলিতে পারিত না। ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় যাহাদের অধিকার ছিল না তাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রথার ব্যতিক্রম প্রচার করিলে, সেই প্রচারিত পরিবর্ত্তন সমাজে সদাচার বলিয়া গণ্য হইত না; প্রথমতঃ তাহা ব্যভিচার বলিয়া নিন্দিত হইত। পরে হয়ত কোনও কোনও স্থলে সেই নবপ্রচারিত পরিবর্ত্তনের সমর্থক পরিব্রাজক জ্ঞানীগণ বিভিন্নদেশ পর্য্যটনকালে সেই সকলদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই নূতন মত প্রচারিত করিতেন ও পরে তাঁহাদের মতানুসরণ করিয়া অপর তীর্থপর্য্যটকগণ সেই নবপ্রচারিত পরিবর্ত্তন দেশবিদেশে ছড়াইয়া দিত। এইরূপ প্রচারের ফলে হয়ত বা কোনও কোনও দেশে বা সম্প্রদায়ে সেই পরিবর্ত্তিত প্রথা প্রচলিত হইত, কোথাও বা হইত না। কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রথা পরিবর্ত্তনের অধিকার কয়জনের ছিল? বিজিত, সমাজ বহির্ভূত অনার্য্যগণের ত ছিলই না; সমাজভুক্ত অনার্য্য বা আর্য্যদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক লোকই ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা আলোচনা করিবার অধিকারী ছিল। আবার শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলে কিছু গুরুগৃহে ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত না। যাঁহারা সুপণ্ডিত গুরুর নিকট ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও মেধাবী তেজস্বী তীক্ষ্ণধী শাস্ত্রবিৎ স্বীয় স্বতন্ত্র মত ঘোষণা করিতেন ও পরে তাঁহাদের অনুগামী পরিব্রাজক ও পর্য্যটকদিগের সাহায্যে তদীয় স্বতন্ত্র মত সাধারণ জনসমাজে প্রচারিত হইত। দলপতি বা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে তখন প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজে প্রচলিত হইত। আবার প্রশ্ন করিতেছি, সেকালে প্রথা পরিবর্ত্তন ব্যাপারে, পরিবর্ত্তিত প্রথানুযায়ী বিভিন্নশ্রেণীর অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশ ব্যাপারে, দেশের সমগ্র অধিবাসীর কয়জনের হাত থাকিত? প্রথাই বল, আর ব্যবহারই বল, চাণক্যোক্ত ধর্ম্ম-ব্যবহার-চরিত্রই বল, আর মানবশাস্ত্রোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারই বল—সেকালে দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপারে দেশের সমগ্র অধিবাসীর মত বা অমত তেমন প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল না। বিভিন্ন জনপদের যে জন কয়েকের মত হইলে সমগ্র অধিবাসী কালক্রমে নূতন প্রথা বা ব্যবহার বা আইন মানিয়া নিত সেই জন কয়েকের মত বা অমত ছিল, সেকালে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। সত্য বটে, সেই জন কয়েকের নূতন মত গড়িয়া তুলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাহা আদৃত করাইতে সময় লাগিত। সুধী সমাজে নূতনপ্রথা প্রবর্ত্তন ও জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচলন—এ দুইই সময় সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু দায়িত্ব ও অধিকারের নূতন নির্দ্দেশ জনসাধারণের হাতে ছিল না। তাহা ছিল মাত্র জনকয়েকের হাতে। সত্য বটে, সেই দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপার, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক" উপাধিভূষিত প্রবল প্রতাপান্বিত, উদ্যত দণ্ড রাজার মতামতের উপরও তেমন নির্ভর করিত না। কিন্তু জনগণ বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিত না, ইহাও নিশ্চিত। অনেকস্থলেই দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপার তৎকালীন আদর্শের অনুরূপ ও জনগণের হিতার্থ সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু জনগণদ্বারা কিম্বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপার সম্পন্ন হইত না। শাসননীতি

নির্দ্দেশ জনগণের বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ছিল না। রাষ্ট্রের সকল লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে, ইহা প্রাচীনকালের আদর্শ নহে।

(২৫)

আধুনিক আদর্শ কি তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জনগণেরই হিতার্থ জনগণদ্বারা জনগণের শাসন। শাসন ও পোষণ দুইই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, ইহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সমগ্র জনগণদ্বারা শাসন ও পোষণ কর্ত্তব্য কিরূপে হইতে পারে? সমগ্র জনগণ সহযোগিতা দ্বারা শাসন ও পোষণ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইতে পারে বটে। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসন ও পোষণোপযোগী যন্ত্রটীত সমগ্র জনগণের হাতে চালাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ যতদিন রাষ্ট্রের বাহিরে শত্রু আছে ও সেই শত্রু সুযোগ পাইলে রাষ্ট্রের বিনাশ সাধনে প্রস্তুত, যতদিন রাষ্ট্রের ভিতরে ও রাষ্ট্রের বাহিরে মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শিকার প্রবৃত্তিটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম, ততদিন শাসন যন্ত্রটী এমন হওয়া চাই যে প্রয়োজন হইলেই অল্প কয়েকজনের সম্মতিতে যন্ত্রটা পূর্ণবেগে চালান যাইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য যতটা বল বা শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, ততটা বল বা শক্তি চালকের ইচ্ছামত ও অবিলম্বে যাহাতে ঐ যন্ত্র হইতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা চাই-ই চাই। এক কথায় রাষ্ট্রশক্তি সমবেত, সুসংবদ্ধ, একলক্ষ্য ও এক কেন্দ্র হইতে চালিত হওয়া চাই (centralised organisation)। নতুবা রাষ্ট্র ও শাসনের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে না। প্রাচীনকালে য়ুরোপে ও এশিয়াতে সময়ে সময়ে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র দেখা দিয়াছিল। সে সকল রাষ্ট্রের জনগণ অল্প পরিসর স্থানে বাস করিত। প্রয়োজন হইলে সে সকল রাষ্ট্রের জনগণ দুই চারি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একত্র হইয়া তাহাদিগের সমিতির নির্দ্ধারণ স্থির করিতে ও তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিতে পারিত। য়ুরোপে এথেন্স, স্পার্টা ও রোম একসময়ে এইরূপ নগর-রাষ্ট্র (city-state) ছিল। চীনদেশে ও আমাদের দেশেও এইরূপ নগর-রাষ্ট্র ছিল। এইসব ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রে সমগ্র জনগণ দ্বারা শাসননীতি নির্দ্দেশ ও নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য সম্ভবপর ছিল। সম্ভবপর ছিল বলিয়া তথায় বস্তুতঃ সমগ্র জনগণের হাতে শাসনযন্ত্র ন্যস্ত ছিল, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, ঐ সকল রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে হেলট্, প্রীবীয়ান্, দাস, অনার্য্য প্রভৃতির সংখ্যা বড় কম ছিল না। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্র আয়তনে বড়, তাহাদের শাসনযন্ত্র সমগ্র জনগণের হাতে রাখা একেবারেই চলে না। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ সম্ভাবনা যতদিন দূর না হইবে, ততদিন সমগ্র জনগণ দ্বারা বড় রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র চালাইবার প্রস্তাব আকাশ কুসুমের ন্যায় কল্পনার বিষয় মাত্র থাকিবে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের জনগণের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের উপায়, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা (Representative) শাসন নীতি নির্দ্দেশ ও তদনুযায়ী কার্য্যের পরিদর্শন। জনগণদ্বারা শাসন সে স্থলে অসম্ভব। জনগণ-প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Representative Government) সম্ভব। শাসননীতি নির্দ্দেশ ও শাসনকার্য্য পরিদর্শন যেস্থলে

থাকে প্রতিনিধির হাতে। জনগণের হাতে থাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার (Vote)। সমবেত, সুসংবদ্ধ, একলক্ষ্য রাষ্ট্রশক্তিকে এক কেন্দ্র হইতে পরিচালিত করিবার ভার কোটী লোকের হাতে না দিয়া কয়েকশত প্রতিনিধির হাতে দেওয়া হয়। আর সেই কয়েকশত পরিচালক প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার (Vote) দেওয়া হয় কোটী লোকের হাতে। আর প্রতিনিধিগণ যাহাতে নির্ব্বাচকদিগের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে তাহার জন্য নির্ব্বাচকদিগের নিকট প্রতিনিধিগণকে দায়ী রাখা হয় (Responsible)। প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচকদিগের মতানুযায়ী কার্য্য না চালাইলে, উপযুক্ত সময়ে নির্ব্বাচকগণ তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে। পুরাতন প্রতিনিধিকে তাড়াইয়া নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে। এইরূপ শাসন ব্যবস্থা ঠিক জনগণ দ্বারা শাসন নহে, ইহা প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Representative Government)। আর প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচকদিগের নিকট জবাবদিহি থাকে বলিয়া, শাসক সম্প্রদায় জনগণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে বলিয়া এই শাসন-পদ্ধতিকে বলে (Responsible Government) দায়িত্বপূর্ণ শাসন। শাসনের জন্য পরিণামে কৈফিয়ৎ দিবার দায়িত্ব জনগণের নিকট।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জনসমাজে সাম্য সংস্থাপনের চেষ্টায় বল বা শক্তির (Force) স্থানে ব্যবহার বা আইনের (Law) প্রাধান্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ; কিন্তু আইন এ সম্পর্কে সভ্যতার শেষ বা সর্ব্বোচ্চ সোপান নহে। এ স্থলে বলিতেছি যে রাজার (King) ও রাজসভার (Court) শাসন অপেক্ষা নির্ব্বাচিত দায়ী প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Responsible and Representative goverment) মানবমনের অধিকতর তৃপ্তি সাধন করে বটে; কিন্তু ইহাও রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশ চেষ্টার শেষ কথা নহে। এখানেও "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা।

কয়েকটি কথা বলিলেই বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ তোমার ও আমার প্রতিনিধি শাসন-যন্ত্র চালাইলেই যে তুমি ও আমি শাসন যন্ত্র চালাইলাম তাহা নয়। শাসন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলে প্রতিনিধির রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু তোমার ও আমার রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের তেমন সুবন্দোবস্ত হইল, এরূপ বলা চলে না। সব সময়ে প্রতিনিধি যে তোমার ও আমার মতানুযায়ী শাসন কার্য্য করিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। অনেক সময়ে তুমি ও আমি হয় ত খোঁজও রাখিব না, প্রতিনিধি কি করিল বা কি করিল না। আর কাজ হইয়া যাইবার পরে খবর পাইলেও, তোমার ও আমার ঐ কাজে অমত ছিল একথা জানাইলেই যে কাজটির সকল কুফল তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় এরূপও নহে। এককথায় বলিতে গেলে, প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ও স্বয়ং শাসন ঠিক এক নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থাটীকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশে দোষ ত্রুটীর সম্ভাবনা হইতে বিমুক্ত করা যায় নাই। আমার মতে হয়ত গোপালবাবু শিক্ষা-বিভাগের বিশেষ কিছুই বোঝেন না, কিন্তু বিচার-বিভাগের এমন সুনিপুণ কর্ণধার তাঁর মত আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকল নির্ব্বাচকদিগের নির্ব্বাচন কার্য্যের ফলে দেখা গেল যে গোপাল বাবু শিক্ষা-বিভাগ বা বিচার-বিভাগ কোনটীতেই কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন না, তাঁহার ভাগ্যে জুটিল সাধারণ-স্বাস্থ্য বিভাগ। অথচ কার্য্যতঃ তিনি

তোমারও প্রতিনিধি, আমারও প্রতিনিধি, আর সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগে শনির অসাধারণ প্রভাব। অনেক স্থলেই তুমি ও আমি নির্ব্বাচিত করিয়া দিই প্রতিনিধিদিগকে, আবার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচন করিয়া দেয় অপর একজনকে এবং সে গিয়া তোমার ও আমার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ হয় ত সে তোমার বা আমার মনোমত প্রতিনিধি নয়। সাত নকলে আসল খাস্তা। তৃতীয়তঃ, নির্ব্বাচন ব্যাপারটীকে নিখুঁত খাঁটি রাখিবার চেষ্টা প্রায়ই বিফল হয়। প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে গেলেই অর্থ ব্যয়। কিছুটা অর্থ ব্যয় করিতে যে প্রস্তুত নহে সে নির্ব্বাচিত হইবার আশা করিতে পারে না। আমি উৎকোচ দিবার কথা বলিতেছি না। দশ বিশ হাজার নির্ব্বাচকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে, তাহাদিগকে নির্ব্বাচন প্রার্থীর মত ও চরিত্রের কথা জানাইতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার কথা বলিতেছি। নির্ব্বাচন ব্যাপারটীকে ধনশালীর প্রতিপত্তি হইতে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। সচ্চরিত্র, সদ্বিবেচক, জ্ঞানী, স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি যদি নির্ধন হন, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইবার আশা খুবই কম। চতুর্থতঃ, নির্ব্বাচকগণ শুধু রাষ্ট্রের ও দেশের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া ভোট (Vote) দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছে, এরূপ অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না। হয়ত বা জমিদারের খাতিরে, নয়ত বা উত্তমর্ণের খাতিরে ভোট অনেকে দিয়া থাকে। কেহ বা শুধু আত্মীয়তার খাতিরে অনুপযুক্ত লোককে ভোট দেয়। এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যায়। এই জন্য বলিতেছিলাম যে স্বয়ং শাসনের নামে প্রতিনিধিদ্বারা দায়িত্বপূর্ণ শাসনের ব্যবস্থা, "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা।

প্রতিনিধিদ্বারা শাসন ব্যবস্থার মূলে আর একটি কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কোনও রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের মতানুযায়ী শাসন নহে, প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া শাসন নহে। অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন হইবে, ইহাই তাহার ভিত্তি। প্রতিনিধিদ্বারা শাসন ব্যবস্থায় অনেক স্থলে কিন্তু অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসনও হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রেও অনেক সময়ে প্রতিনিধিদ্বারা শাসনকার্য্যও অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন নহে। অল্পাংশ অধিকাংশের সহিত একই রাষ্ট্রে বাস করে। তাই বলিয়া অল্পাংশের অধিকার যে একেবারে নগণ্য, তুচ্ছ, এরূপ মনে করিবার কোনও সুযুক্তি নাই। অধিকাংশ যাহা বলিবে অল্পাংশকে সর্ব্বদা সকল ব্যাপারে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে, এরূপ বিধান হইলে, অল্পাংশের লোকের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায়। রাষ্ট্রের অধিকারের সহিত যেমন প্রজার ব্যক্তিগত অধিকারের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন, তেমনই অধিকাংশের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সহিত অল্পাংশের রাষ্ট্র সম্পর্কিত অধিকারের সামঞ্জস্য সাধন চাই। নতুবা রাষ্ট্রপতির অত্যাচারের ন্যায় অধিকাংশের অত্যাচার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিবে।

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত শাসন ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে জনগণদ্বারা শাসন বৃহদায়তন রাষ্ট্রে বেশীদিন চলে নাই। আজ যদি ভারতবর্ষ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে ও বৃটিশ্ সাম্রাজ্যের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, কাল আমরা এই প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ব্যবস্থা এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইব। আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ব্যবস্থারই শরণাপন্ন হইব। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি তথাকার জনগণের

রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের ইহাপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায় আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। কোনও কালে পাইবে না, একথা আমি বলিতেছি না। শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানী বা অপর কোনও রাষ্ট্র আজও নূতন পথ বাহির করিতে পারে নাই। রুশদেশ নূতন পথে চলিবার দুরন্ত প্রয়াস করিয়াছে। সেও আজ বৈরাজ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র ও প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, পথে নর-শোণিতের নদীতে আজও হাবুডুবু খাইতেছে। স্বাধীনতা আজ সেখানে মুমূর্ষু অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশও বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমরা স্বরাজ সাধনার পথে সবে পা দিয়াছি। সে পথে দেহকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শুধু মন ও আত্মা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের স্বরাজসাধনার পথে কখনও অসহযোগ, কখনও বিরুদ্ধাচরণ। কিন্তু সংযোগিতা সে পথে নিত্য সাধনার বিষয়। পুঞ্জীকৃত জঞ্জাল দূর করিবার জন্য বিনাশ চেষ্টাও সে পথে চাই, কিন্তু গঠনচেষ্টা তথায় নিত্য কর্ত্তব্য। আত্মনির্ভর সে পথে পরম সম্বল, কারণ আত্মশক্তিবোধ না হইলে সে পথে এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু হঠকারিতা সে পথে বিষম অন্তরায়। যেমন চাই নিজের শক্তিও পুরুষকারে পূর্ণ আস্থা, তেমই চাই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি ও পুরুষকারের পরিমাণ নিরূপণ। জাতীয়তাগঠন তথায় আপাততঃ অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্বমানবে প্রেম সে সাধনা হইতে নিরাকৃত হইলে তাহারও শাস্তিভোগ আমাদিগকেই করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাদ দিয়া বিশ্বমানব নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীও বিশ্বমানবের অন্তর্ভুক্ত ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। গঠনের পথ বা বিনাশের পথ, সহযোগের পথ বা অসহযোগের পথ, যে পথেই সাধনা কর সর্ব্বত্র চরিত্রবল চাই। আর চরিত্রবল শুধু সংযম, স্বার্থনাশ, সহিষ্ণুতা, অহিংসা, ধৈর্য্য নহে। স্বাবলম্বন, অধ্যবসায়, শ্রমাভ্যাস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিঘ্নসিদ্ধিতে নিপুণতা, দশের সহিত সমবেত উদ্যোগে উৎসাহ, দৈনিক জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সততা ও সুশৃঙ্খলা ও সর্ব্বোপরি স্বদেশপ্রেম—এ সকলই চরিত্রবলের উপাদান। শুধু অভাবাত্মক গুণগুলিতে সিদ্ধ হইলে হইবে না। ভাবাত্মক গুণের সাধনা চাই। আর স্বদেশপ্রেম ত শুধু স্বদেশের আকাশ ও বাতাস, ধূলি ও জল, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের প্রতি টান নয়; স্বদেশের মানুষের প্রতি প্রেম। স্বদেশের মানুষের অধিকার প্রতিদিন সম্মান করিতে হইবে। শুধু ধনীর অধিকার নয়, নির্ধনের অধিকারও মানিয়া চলিতে হইবে। শুধু মানীর প্রতি সম্মান নয়, অমানীর প্রতিও সম্মান দেখাইতে হইবে। শুধু পুণ্যবান্‌কে নয়, পাপীকে ভাল বাসিতে হইবে। আমার স্বরাজের আদর্শ যে পদদলিত করিতেছে তাহাকেও প্রেম করিতে হইবে। শুধু অভাবাত্মক "অহিংসা" (Non-violence) সাধনে স্বদেশপ্রেম সাধনা হইবে না। চাই ভাবাত্মক প্রেম (Love) সাধনা। এ বিশাল, মহান্ আদর্শের যোগ্য সাধক কয়জন? আমি ত নই। তবুও "স্বরাজ", "স্বরাজ" বলিতেছি। নিজের নগণ্য ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ না করিয়া পারিতেছি না। তোমরা দশজন তোমাদের শক্তি নিয়োগ করিলে আমার ন্যায় দুর্ব্বল সেবকও হৃদয়ে বল পাইবে। "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ॥

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উত্তর চরিতের চতুর্থাঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্কে বিদস্তকে সৌধাতকি ও ভাণ্ডায়ন নামে বাল্মিকীর দুইজন শিষ্য দেখা দিল। সৌধাতকি পাঠে অমনোযোগী, ক্রীড়ায় বাসনা, ব্যবহারে দুর্বিনীত আর সর্ব্বত্রই অসংযতবাক্। ভাণ্ডায়ন তাহার বিপরীতই ছিল। বাল্মিকীর উপযুক্ত ছাত্র; কি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কি ভদ্রোচিত ব্যবহার, কি সংযত বাক্, কিবা সংযতমধুর বাণী। ভাণ্ডায়নের কথায় জানিতে পারা গেল যে, রাজর্ষি জনক সীতার দুর্বিপাকজনিত দুঃখে বানপ্রস্থাশ্রমে চন্দ্রদ্বীপতপোবনে এতদিন তপস্যায় রত ছিলেন। আর আজ সেই তপোবন হইতে বাল্মিকী আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজর্ষি জনক আজ সীতাশোকে দহ্যমান বনস্পতির অবস্থায় উপনীত। সীতার সে নির্ব্বাসন দুঃখে ব্রহ্মবাদী রাজর্ষির মর্ম্মস্থল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সে শোক সে দুঃখের বিরাম নাই। বশিষ্ঠ ও বাল্মিকীর সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া ক্লান্ত রাজর্ষি বাল্মিকীআশ্রমে বহির্বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। অবসাদে ক্লান্তিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ মুদ্রিত। সেই মুদ্রিত চক্ষুর উপর সীতার সেই কাঁদ কাঁদ মুখখানি অস্পষ্ট ভাসমান। একে বার্দ্ধক্য তায় দারুণ ব্যথা—তার উপর পরাক শান্তবান প্রভৃতি কঠোর ব্রতপালনের কষ্ট, তথাপি ত দগ্ধদেহের বিনাশ নাই। আত্মঘাতীর গতি অন্ধতামিস্র লোকে,—কাজেই ব্রহ্মবাদী ঋষি স্বেচ্ছায় দেহপাত করিতে পারেন না। অথচ সেই দেহভার আর বহন করাও তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব।

মনে পড়ে যখন সীতার সেই নির্ব্বাসন দণ্ড, তখন জনকের ধৈর্য্য আর থাকে না। বসুন্ধরাকে পর্য্যন্ত কঠোরা বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। বসুন্ধরে, অগ্নি যাহার পবিত্রতার সাক্ষী, সেই স্বতঃপবিত্রা তনয়ার এই কুৎসিত নির্ব্বাসন মা হইয়া কেমন করিয়া সহ্য করিলে ?”

ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আজ শেষ হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী ও কৌশল্যা-সহ ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়াছেন। সেই পুণ্যশ্রীললামভূতা সীতা নাই। সে রাজলক্ষ্মী অধ্যাসিত রাজ্য নাই। রাজধানী এখন শ্রীহীনা; তথায় আর সুখ নাই; কৌশল্যাদির মনেও শান্তি নাই। বশিষ্টদেবের অভিপ্রায় অনুসারে ফিরিবার পথে সকলে বাল্মিকী আশ্রমে উপনীত। আসিয়া দেখেন, রাজর্ষি জনক তথায় উপস্থিত। হায়, কৌশল্যা কেমন করিয়া রাজর্ষি জনকের নিকট মুখ দেখাইবেন! সীতা পরিত্যাগ করিয়া রাম যে কেবল রাজর্ষির মাথায় বেদনা ভার চাপাইয়াছে তাহা নহে, দারুণ অপমানের বোঝা ও চাপাইয়াছেন। নিজের পুত্রের এই আচরণে কৌশল্যা বড় লজ্জিতা, বড় দুঃখিতা। রাজর্ষির সাক্ষাতে বাহির হইতে কৌশল্যা চাহেন না। এদিকে বশিষ্ট-দেবের আদেশ, নিজে যাইয়া রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন অগত্যা কৌশল্যা রাজর্ষির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৌশল্যাকে দেখিলে কে বলিবে যে, সেই কৌশল্যা। দশরথের গৃহের সেই লক্ষ্মী আজ দীনা ভিখারিণীর মত উপস্থিত। সেই মণিমাণিক্য ভূষিতা রাজরাণী বিধবার ভিখারিণীর সাজে সজ্জিতা; অবস্থার কি পরিবর্ত্তন! জনকের

নিকট যে কৌশল্যা একদিন মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের মত ছিল, আর আজ সেই কৌশল্যার দর্শন, ক্ষতে লবণক্ষেপের মত কষ্টকর দাঁড়াইয়াছে। দশরথের মত স্বামীর সেই দুঃখকর মৃত্যু, তার উপর স্বতঃশুদ্ধা সীতার সেই অপমানজনক নির্ব্বাসন কৌশল্যার শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। ফলপুষ্পময় রাজোদ্যান আজ শ্রীহীন, আগাছায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কৌশল্যার চরণ আর বহে না। কুলগুরুর আদেশ—কৌশল্যা কোনমতে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়া যন্ত্রের মত অগ্রসর হইতেছে। হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া দুরু দুরু কাঁপিতেছে। ভিতরের কথঞ্চিৎ রুদ্ধ ব্যথা আজ দ্বিগুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রিয়জন দর্শনে ব্যথা প্রবল হইয়া উঠে, ইহাই মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, কৌশল্যারও তাহাই হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,

দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃ সহস্রৈরিব সংপ্রবন্তে॥

প্রিয়জন সমাগমে দুঃসহ দুঃখ সহস্র স্রোতোধারায় মানবকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কুমার সম্ভবে কালিদাসও বলিয়াছেন—

"স্বজনামি হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে"

বহুদিনের বিস্মৃতিতে শোকের উপর যে আবরণ পড়ে, প্রিয়জনের সাক্ষাতে সেই আবরণ দূর হইয়া যায়। আবরণই এখানে দ্বার।

কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট নিজের শোক দুঃখ তুচ্ছ করিয়া কৌশল্যা জনকের সাক্ষাতে উপস্থিতা। স্বামীর প্রাণোপম বন্ধু, বৎসা সীতার স্নেহময় পিতা, নিজের পরমাত্মীয় সুহৃৎ, সেই রাজর্ষি জনক কি এই? এই "অনুপস্থিত মহোৎসব" দিনে আমি কিরূপে সম্ভাষিতা হইব—কৌশল্যা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

রাজর্ষি জনক ভগবতী অরুন্ধতীর নিকট যাইয়া ভূতলনমিত শিরে জগদ্বন্দ্যা উষাদেবীর মত তাহাকে বন্দনা করিলেন। সে বন্দনাটি বড় মধুর। আর তাহাতে অতীত ভারতে উপযুক্ত রমণীর মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহার একটি চিত্র পাওয়া গেল।

যথা পূতম্মণ্যো নিধিরপি পবিত্রস্য মহসঃ
পতিস্তে পূর্ব্বেষামপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ।
ত্রিলোকী মঙ্গল্যামবনিতল লোলেন শিরসা
জগদ্বন্দ্যাং দেবীমুষসমিব বন্দে ভগবতীং॥

লোকে আশীর্ব্বাদ করে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক। অরুন্ধতী আশীর্ব্বাদ করিলেন "পরংজ্যোতি স্তে প্রকাশতাম্"—সেই পরাজ্যোতি তোমাতে প্রকাশিত হউক।

কঞ্চুকি রাজান্তঃপুরের রক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাত্র। সেই পুরাকালেও ব্রাহ্মণের দাসত্ব। বাস্তবিক এ অধঃপতন কালিদাস ও ভবভূতির আমলেরই। রাজর্ষি কঞ্চুকিকে আর্য্য সম্বোধন করিয়া তাহার সম্মান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও মহানুভবতা প্রদর্শন করিলেন, "আর্য্য, প্রজাপাল মাতার কুশল তো?" প্রজাপালনের অনুরোধে যে নিজের স্ত্রীকে, স্বতঃপবিত্রা সীতার মত প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই প্রজাপালক রাজার মাতার কুশল তো?

কি মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা, কি বিস্মিত? ঔদাসীন্য। বিকৃত হৃদয় হইতে [illegible] আমার একটি

গৈরিক নিঃস্রাব ফুটিয়া উঠিল। কঞ্চুকির মনে হইল, কৌশল্যার প্রতি ইহা একটি নিষ্ঠুর তিরস্কার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জনকের যে এ উক্তি, তাহা নহে। নিষ্ঠুর পরিহাস বা মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ করাই তাঁহার যে অভিপ্রায় তাহাও নহে। কঞ্চুকির সেই মামুলী কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টায় জনকের হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, আত্মমর্য্যাদা দ্বিগুণ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। একদিন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"উৎপত্তিপরিপূতা" সীতার আবার শুদ্ধি কি? আর আজ সীতাপিতা জনকও গর্জ্জিয়া উঠিলেন ——

"আঃ কোহয়মগ্নির্নাম অস্মৎ প্রসূতি পরিশোধনে" সীতাই ত আমার মূর্ত্তিমতি শুদ্ধি, তার আবার শুদ্ধি কি। রাম ত একদিন অপমান করিয়াছে, আবার আজও অপমানিত হ'লেম।

অরুন্ধতী জনকের বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি করিলেন। তারপর সীতার উদ্দেশ্যে একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার নাসাপুট হইতে উত্থিত হইল। সপ্তর্ষি বরণীয়া জগদ্বন্দ্যা অরুন্ধতী সীতাকে কি ক্ষোভে দেখিতেন, স্নেহের সঙ্গে কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ পাইল।

বৎসে,

শিশুর্ব্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতু তথা।
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং জনয়তি,
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ॥

বৎসে (সীতে) শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও তুমি আমার যা, তুমি তাই থাক। কিন্তু তোমার পবিত্রতার উৎকর্ষ তোমার প্রতি আমার ভক্তি জন্মাইয়া দিতেছে। শিশুত্বই থাক, আর স্ত্রীত্বই থাক, তবু তুমি জগতের বন্দনীয়া। গুণই পূজার প্রকৃত প্রবর্ত্তক, লিঙ্গও (স্ত্রী পুরুষই লিঙ্গ) নহে, বয়সও নহে।

একদিকে জনকের অন্তঃস্তম্ভিত শোক, স্বতঃউৎসৃত জ্বালার অভিব্যক্তি, আর অন্যদিকে অরুন্ধতীর শান্ত নিরুপদ্রুত স্নেহ, স্নিগ্ধ কোমল শ্রদ্ধার প্রকাশ। একদিকে গৈরিক নদ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরদিকে বননদী স্নিগ্ধ কোমল ছায়াখানি বুকে করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

কৌশল্যার হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হইল— তখন কৌশল্যার মনে পড়িল সেই প্রাণপ্রিয়পতি দশরথের কথা। সেই রাজর্ষির সহিত অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধুতা। স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠিল সেই শিশুদের কোমল মুখকয়খানি, সেই অতীতের মধুময়ী ছবি। তখন রাজরাণীর সেই কুসুম সুকুমার হৃদয়ে বহুদিনের রুদ্ধ বেদনা উথলিত হইয়া উঠিল। দারুণ দশা বিপর্য্যয় সহ্য করিতে না পারিয়া কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

রাজর্ষির উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য কোথায় ভাসিয়া গেল। হৃদয়ের যে উষ্ণ জ্বালা অকস্মাৎ যেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। তখন রাজর্ষির চিন্তাস্রোত অন্যখাদে বহিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ দশরথ কি ছিলেন? দ্বিতীয় হৃদয়, মূর্ত্তিমান আনন্দ, প্রাণ ধারণের ফল, না আর কিছু ছিলেন শরীর, জীবন—না—তাহা হইতেও প্রিয় কিছু ছিলেন। সেই দশরথের প্রাণ প্রিয়তমা, আমার সেই প্রিয় সখী যে এই। যাহাদের ভালবাসার আমি সঙ্গী ছিলেম, আনন্দের অংশভাগী

ছিলেম, আর প্রণয় কোপেও যাহাদের মৃদুভর্ৎসনার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেম,—সেই প্রিয় সখী কৌশল্যার প্রতি কি নৃশংস ব্যবহারই না করিলাম।

কৌশল্যা ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন—তাঁহার অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষুদুটি তখন সীতার মুখ পুণ্ডরীক দর্শনাশে ব্যাকুল, বাহুলতা সেই জ্যোৎস্নাসুন্দর অঙ্গলতিকার আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র। মহারাজ দশরথ বলিতেন "সীতা রঘুবংশের বধূ কিন্তু জনকসম্বন্ধে সীতা আমাদের দুহিতা"।

সম্বন্ধের বীজ সীতা আর নাই; তবু দগ্ধ জীবন ত যায় না, বজ্রলেপ দিয়া কে যেন প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাই আর প্রাণ নড়িতে চড়িতে চায় না। রোদনের স্রোত বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া অরুন্ধতী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং "পরিণাম ফল ভালই হইবে" কুলগুরুর এই আদেশটিও স্মরণপথে আনয়ন করিলেন। স্নেহ সর্ব্বদাই বৈকল্যই আশঙ্কা করে। তাই কৌশল্যা বলিলেন—

"ভগবতি, সীতাকে আবার পাইব—সে মনোরথ চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে"— এই কথায় অরুন্ধতীর আত্মমর্য্যাদা একটু ক্ষুণ্ণ হইল। "শুভপরিণাম হইবে" বশিষ্ঠদেবের ইহাই আদেশ তাহাতে অবিশ্বাস। পতিব্রতা নারী বশিষ্ঠ দেবের মত পতিদেবতার উপর রাজ্ঞীর এই অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করিয়া যেন একটু উত্তেজিতার মত হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যিনি স্নেহের কোমলা মূর্ত্তি ছিলেন, এক্ষণে তিনি আবার ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী, সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী অরুন্ধতী কৌশল্যাকে কহিলেন,

"তবে কি রাজপুত্রী, বশিষ্ঠ দেবের বাক্য মিথ্যা হইবে মনে করিতেছ? সুক্ষত্রিয়ে, মনে অন্য প্রকার ভাবনা আনিয়ো না, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে। "সেই আবির্ভূত ব্রহ্মজ্যোতি" ব্রাহ্মণের বাক্য কখন নিষ্ফল যায় না, তাঁহাদের বাক্যের উপর নিয়তই সিদ্ধি বাস করে। সে ব্রাহ্মণেরা কখনও বিফল বাক্য উচ্চারণ করেন না। রামচন্দ্র একদিন অষ্টাবক্র ঋষির "বীরপ্রসবা হও" (সীতার প্রতি) এই আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি" (১মাঙ্ক)

নেপথ্যে কল কল রব উত্থিত হইল। বশিষ্ঠ জনকাদির আগমন জন্য বালকগণের আজ 'শিষ্টানধ্যায়' *; কাজেই মনের আনন্দে বালকগণ আজ খেলাধূলায় মত্ত। কৌশল্যা শোকের মূর্ত্তি। বালকগণের আনন্দ কোলাহল তাঁহারও চিত্তে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ফুটাইয়া দিল। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন "সুলহং সোঁখ্‌খং দাব বালঅত্তং হোদি" বাল্যকালে চিন্তার উদ্বেগ নাই, শোক দুঃখের কোনও কারণ নাই, কাজেই শিশুদের সর্ব্বদাই আনন্দভাব।

সেই বালকগণের মধ্যে একটি বালকের মুখশ্রী সকলকার লোচনপটে ফুটিয়া উঠিল। সেই বালকই লব। তার সেই কুবলয়দল স্নিগ্ধ ঘন শ্যামবর্ণ সেই মনোরম কাকপক্ষ চূড়া, সেই সৌষ্ঠবপূর্ণ মুগ্ধ ললিত অঙ্গের মধ্যে কৌশল্যা রামভদ্রবই শ্রী প্রত্যক্ষ করিলেন। জনকের মনে হইল, রঘুনন্দনই যেন আজ শিশুরূপে দণ্ডায়মান। এ কে রে? নয়নের অমৃতাঞ্জন স্বরূপ এ বালকটী কে রে? সপ্তর্ষিবন্দিতা অরুন্ধতী ভাগীরথীর মুখে অগ্রেই সমস্ত রহস্য

* শিষ্টানধ্যায় = শিষ্টজন আগমন হেতু অনধ্যায়, অর্থাৎ ছুটী।

অবগত ছিলেন। বৎসা সীতার যে দুইটী যমজ পুত্র, আর তাহারা যে বাল্মিকী আশ্রমে নীত অরুন্ধতী অগ্রেই তাহা শুনিয়াছিলেন। এই পুত্রটী যে সেই যমজ পুত্রেরই অন্যতম ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

আশ্চর্য্য এ বালক এ ত ব্রাহ্মণ বালক নহে—এ যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী—নহিলে বাণপূর্ণ তূনীরদ্বয় পৃষ্ঠে থাকিবে কেন? এদিকে ভস্মলিপ্তবক্ষ, পরিধেয় মৃগচর্ম্ম, আবার বাহুতে কার্ম্মুক শোভমান। জপমালা ও অশ্বত্থদণ্ডের সঙ্গে "উৎকট কোটিক" শরাসনের মিলন বস্তুতই আশ্চর্য্যকর।

লবের 'বিনয়মসৃণ তেজ' মধুরনম্র ব্যবহার, সুন্দর অভিবাদন প্রণালী দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। অরুন্ধতী লবকে ত একেবারেই কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। শুধু যে তাঁহার কোলই ভরিয়া গেল তাহ নহে। বহুদিনের মনোরথ ও সম্পূর্ণ হইল। অরুন্ধতী যে লবকেই সীতার পুত্র জানিয়া কোলে লইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার ত আনন্দ জন্মিবারই কথা। কিন্তু কৌশল্যা ত লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানেন না। তবু তিনি যখন লবের নীলোৎপলশ্যাম অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, কলহংস নিনাদবৎ মধুরগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন, তখন তাহারও মনে হইল, যেন শিশু "রামচন্দ্র" আসিয়া কোলে বসিয়া আছে। ভাল করিয়া লবের মুখখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রামের মাতা দেখিতে পাইলেন যে, লবের মুখশ্রীতে যেন বধূ সীতারও মুখশ্রীর ছায়া ফুটিয়া রহিয়াছে। লব পিতার দেহ গঠন, কণ্ঠস্বর, ধীরোদাত্ত গতি ও অনুভবগাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখশ্রী হইয়াছে মাতারই মুখের মত। শাস্ত্রেও বলে, মাতৃমুখা সন্তানই সৌভাগ্যবান্।

স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই এই। বালকদিগকে মাতাপিতার কথাই অগ্রে জিজ্ঞাসা করে। কৌশল্যার হৃদয়ে আশার যে ক্ষীণরশ্মিটুকু জাগিবার উপক্রম করিয়াছে—প্রশ্নও তদনুরূপ হইবারই কথা, হইলও তাই। কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মা আছেন বাপকে মনে পড়ে?" হৃদয়ের অস্ফুট আশা আজ বাণীরূপে প্রকাশিত হইতেছে, নহিলে মার বেলায় 'আছেন'? আর বাপের বেলার "মনে পড়ে"? এরূপ প্রশ্ন উঠে কেন? সীতার পুত্র, সীতা কাছেই আছে, রাম ত নিকটে থাকিবেন না। অবশ্য কৌশল্যা যে এই ভাবিয়াই ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা না হইতে পারে।

লব কিছু জানে না—জন্ম ত্যাগের পরই তাহারা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাল্মিকী আশ্রমে প্রতিপালিত। সীতা তাহাদের মাতা রামচন্দ্র তাহাদের পিতা—ইহা তাহারা জানে না। তাহারা জানে, তাহারা বাল্মিকীর, উত্তরও দিল তাই। কৌশল্যা সে উত্তর শুনিতে চাহেন না। তাঁহার মন চাহে না। তাই তিনি বলিলেন—"যাহা প্রকৃত বলিবার তাহাই বল।" বাল্মীকি ত আর বিবাহিত নহেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিবে।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী। সহধর্ম্মচারিণী ব্যতীত অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না; তাই হিরন্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি পার্শ্বে রাখিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়াই বিধি। লক্ষণের পুত্র চন্দ্রকেতু দিগ্বিজয়ে অশ্ব লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ঘটনাক্রমে বাল্মিকী আশ্রমে অশ্ব উপস্থিত। চন্দ্রকেতুও অশ্বের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে উপনীত। জনকের সহিত কথোপকথনে লব মহর্ষি বাল্মীকির রচিত রামায়ণের কথা পাড়িল এবং জানাইল—"প্রাপ্তপ্রসববেদনা সীতার বনবাস পর্য্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণে পাঁচ মাস গর্ভাবস্থায় বাল্মীকি আশ্রমের সম্মুখেই লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতা বিসর্জ্জিত হন। কিন্তু ভবভূতি সীতাকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় পূর্ণ অরণ্য ভাগীরথী তীরে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (এ সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা প্রথমাঙ্ক সমালোচনায় অগ্রেই করিয়াছি)। এবং রামায়ণের কিয়দংশ লইয়া একখানি নাটকও প্রণীত হইয়াছে, এবং সেই নাটকখানি অভিনয়ার্থ নাট্যগুরু ভরতঋষির আশ্রমে প্রেরণও করা হইয়াছে। নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ সেই নাটকখানি পৌঁছিয়া দিবার ভার লইয়া সশস্ত্র যাত্রা করিয়াছে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা যেন একটু হতাশ একটু মুহ্যমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ভাইও আছে!" "ভ্রাতা আছে"—তবে ত সীতার পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তারপর তখন যমজ ভ্রাতার কথা শুনিলেন, তখন যেন আবার আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন।

মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হইয়া রামচন্দ্র পূর্ণগর্ভা সীতাকে অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—লবের মুখে এই কথা শুনিয়া কৌশল্যা কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা জনক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"উঃ—সেই নিদারুণ পরিত্যাগের অপমান, তার উপর প্রসবের ব্যথা, আর চারিদিকে হিংস্র বন্যজন্তুর কোলাহল। বৎসে সীতা! ভয়ে ভীত হইয়া কতই বার আমাকে "রক্ষা কর" বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে? হা বৎসে,

নূনং ত্বয়া পরিভবঞ্চ নবঞ্চ ঘোরং তাঞ্চ ব্যথাং প্রসবকালকৃতামবাপ্য

ক্রব্যাদগণেষু পরিত পরিবারয়ৎসু সন্ত্রস্তয়া শরণমিত্যসকৃৎস্মৃতোঽস্মি।

জনকের স্নেহময় চক্ষুর উপর সীতার সেই অশরণ অবস্থার ছবি ফুটিয়া উঠিল। অরুন্ধতী ও কৌশল্যা বিশেষতঃ বালক লবের সম্মুখে রাজর্ষির আত্মমর্য্যাদা মাথা খাড়া দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পৌরজনের কুমর্য্যাদা আর রামের অবিমৃষ্যকারিতা মনে পড়িল। উঃ—এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সীতার এই নিন্দিত নির্ব্বাসন, এই নিদারুণ দশা বিপর্য্যয়!— চিন্তা করিতে করিতে জনকের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কোপানল অবসর পাইয়া আজ অস্ত্রমুখে বাহির হইতে চাহে। "অস্ত্রগূঢ় ঘনব্যথা" অভিশাপের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। কৌশল্যা দেখিলেন, সর্ব্বনাশ; এখনই বুঝি অযোধ্যা দগ্ধ হইয়া যায়, রাজপরিবারবর্গ অভিশপ্ত হইয়া উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়; রঘুকুল ছারেখারে যায়। রাজমাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। "ভগবতি ক্রুদ্ধ রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন।"

অরুন্ধতী দেখিলেন—শম প্রধান তপোবনে আজ দাহাত্মক, গূঢ় তেজ জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। তপস্যাবর্দ্ধিত ক্ষাত্রীয়তেজ আজ ভয়ানকরূপে দেখা দিয়াছে। তখন অরুন্ধতী বৎস রামভদ্রের করুণদুর্ব্বল ছবিখানি ক্রুদ্ধ রাজর্ষির সম্মুখে ধরিলেন; প্রতিপাল্য হতভাগ্য পৌরজনবর্গের প্রকৃত অবস্থা মনে করাইয়া দিলেন। তখন জনকের সেই দারুণ কোপানল শান্ত হইয়া আসিল। পুত্রস্থানীয় রামভদ্রের উপর একটি করুণ সমবেদনা জাগিয়া উঠিল। "ভূয়িষ্ঠদ্বিজ-বালবৃদ্ধবিকল স্ত্রৈণশ্চ পৌরো জনঃ।" বলিয়া রোষপ্রকাশ নিষ্ফলবোধে রাজর্ষি শান্ত হইলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণবালকগণ নূতন জীবটিকে দেখাইবার জন্য লবকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণকরিয়া লইয়া গেল। লব শাস্ত্রজ্ঞানে বুঝিল অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অশ্ব।

"বিশ্ববিজয়িনাং উর্জ্জস্বলঃ সর্ব্বক্ষত্রিয় পরিভাবী মহান্ উৎকর্ষানদর্যঃ" লবের ব্রহ্মচর্য্য-শান্ত ক্ষত্রিয় তেজঃ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর যখন শুনিল

অয়মশ্বঃ পতাকেয়মথবা বীর ঘোষণা।

সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ॥

এই ক্রোধোদ্দীপক অক্ষর, এই রাজসিক বাণী লবের ক্ষাত্রীয় তেজে প্রচণ্ড আঘাত করিল। "কি, পৃথিবী কি নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে"—বলিয়া লব অন্তরের মধ্যে একটি ব্যথা অনুভব করিলেন—

"ন তেং তেজস্বী প্রসৃতমপেরেষাং প্রমহতে"

"মহারাজ রামচন্দ্রের নিকট আবার ক্ষত্রিয় কে?" রাজপুরুষের এই দর্পিত বাণী শুনিয়া লব তখন রামচন্দ্রের জয়বৈজয়ন্তী, সেই উৎকর্ষ নিকর্ষস্বরূপ অশ্বটি গ্রহণ করিলেন। তখন লবের কথাতে ব্রাহ্মণবালকেরা অশ্বকে তপোবনের মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া গেল। "সক্রোধদর্প রাজপুরুষবর্গের দীপ্যমান অস্ত্রশ্রেণী ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লবেরও উৎকট কোটি কোদণ্ড হইতে ঘন ঘর্ঘর ঘোষ উত্থিত হইল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ও কে ডাকে!

সন্ধ্যাবেলায় ভোরের পাখীর সুরে ও কে ডাকে

পেয়ে জাগরণের সাড়া, শ্রান্ত পাখায় দিচ্ছি নাড়া,

জীর্ণ শিরায় বাসি নেশা টাট্‌কা ব্যথায় জাগে গো!

শীর্ণ ধারা দিবি ঢেলে, পিছন পানে উজান ঠেলে,

রে অজানা! একি খেয়াল চালাস জোরের ঝাঁকে গো?

খেয়াল, খেলোয়াড়ের প্রাণে জিত্‌বে কানা কড়ির দানে!

তাই কি গো সে আমায় টানে নিগূঢ় স্নেহের গানে গো?

সাঁজের আঁধার ঘরের ধাপে; ভোরের সুরে গীতি কাঁপে,

আকুল আশা ব্যথায় জাগে; তাকের উপর ডাকে গো!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মানব জীবন ও জাতীয় উন্নতি।

মানুষকে আমরা যতই স্বাধীন মনে করি না কেন, তাহার বার আনা রকম কার্য্য-কলাপ প্রকৃতির বশে। মানুষের কতকগুলি প্রকৃত দত্তপ্রবৃত্তি আছে এবং সেগুলিকে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি। এই স্বতঃপ্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ চলিয়া থাকে। এই হিসাবে দেখিলে, মানুষ কলের পুতুলের মত কেবল প্রবৃত্তির অনুশাসনেই চালিত হয়।

মানুষের যৌথপ্রবৃত্তি (১) আছে তাই অনেক লোক একসঙ্গে বাস করে এবং ইহাকে আমরা কুল সংঘ, সমাজ, উপজাতি, জাতি ইত্যাদি বলিয়া থাকি। মানুষের স্নেহ আছে, প্রেম আছে, এই জন্য মানুষের পারিবারিক জীবন। মানুষের অর্জ্জন লিপ্সা (২) বা ধন লিপ্সা আছে সেই জন্য ব্যবসায় বাণিজ্য, সেই জন্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়। বালকের পকেট অনুসন্ধান করিলে উহার ভিতর কত কি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা বালকের অর্জ্জন প্রবৃত্তি। ইতর জীব হইতে ছেলে বুড়া সকলেই খেলা প্রিয় এবং ইহাও একটা প্রবৃত্তি। এইরূপ চৌদ্দ পনরটা প্রবৃত্তি মানুষের আছে এবং উহা বিজ্ঞান সম্মত। লয়ড মরগ্যান, রোমেনস্, ম্যাকডুগাল, থরনডাইক্ প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিৎ ও মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার বিষয় অনেক লিখিয়াছেন। আর একটা প্রবৃত্তি আছে ইহাকে আমরা কৌতূহল প্রবৃত্তি (৩) বা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বলিতে পারি এবং ইহার ফলে মানুষ নূতন তত্ত্ব ও তথ্য বাহির করিয়াছে ও করিবে। কৌতূহলকে কেহ কেহ রস বলিয়া থাকেন। এই রস (বা ইমোসন্) মানবজীবনে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। আবার মিশ্র রসও আছে, তাহাকে আমরা ভাব বলিব এবং ইংরাজীতে উহা সেন্‌টিমেণ্ট বলে। দেশ-প্রেম একটা ভাব যেহেতু উহাতে প্রেম, মমতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি রস সন্মিলিত আছে। এই জন্য ধর্ম্ম, নীতি ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধিও ভাব, উহা রস নহে। কারণ উহারাও বহু রস আশ্রিত। ভাবই মানব জীবনের বিশেষত্ব, উহাই সভ্যতার মূল। তবে ভাবের সহিত বুদ্ধির ও যুক্তির সংযোগ না থাকিলে সে ভাব কুসংস্কারের নিদর্শন হইয়া পড়ে।

কেবল যে মানুষেরই যৌথ প্রবৃত্তি আছে তাহা নহে অপর জীবও বন্যাবস্থায় এই প্রবৃত্তির বশীভূত, এই সকল বন্য-জীবকে কোন উপায়ে ধরিয়া রাখিলে বড়ই অস্থির হয় এবং ছাড়িয়া দিলে একবারে দলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। যৌথ বৃত্তি মেরুদণ্ডবিহীন জীবের মধ্যেও দেখা যায়। পিঁপড়ে ও মৌমাছির একত্র বাস প্রবৃত্তি সকলেরই সুপরিচিত। মৌমাছির সমাজ ও উহাদের স্বতঃ বুদ্ধি প্রাণীতত্ত্বাবদের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই মৌমাছির চাক যেন একটি গ্রাম, উহাতে শ্রম বিভাগ আছে এবং পরস্পর সাহচর্য্য আছে। উহারা চাকখানি এমন পরিষ্কৃত করিয়া রাখে যে মানুষে তাহার গ্রামকে সেরূপ ভাবে পরিষ্কৃত রাখিতে পারেনা। পরিষ্কার রাখার কাজটা কতকগুলি

---

(১) Gregarious.
(২) Acquisitiveness.
(৩) Curiosity.

মৌমাছির নির্দ্দিষ্ট আছে ইহা ছাড়া চাক নির্ম্মাণ কাজ, মধু সংগ্রহ, অণ্ড সংরক্ষণ, এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ঐরূপ ভাবের ব্যবস্থা আছে। যদিও উহারা মৌমাছি। তবুও ইহাদের কর্ম্মকুশলতা মানুষের অনুকরণ যোগ্য।

মৌমাছির জীবন ও সব যুগেযুগে এক ভাবেই চলিয়াছে হয়ত উহাদের আকার, গঠন বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু উহাদের স্বভাব বুদ্ধিও দুই একটা বাড়িয়া থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে আর কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না। মৌমাছিজীবনযাত্রার বোধ হয় ঐ ভাবেই শেষ। কিন্তু মানুষের বেলায় তাহা হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা ও আণ্ডামান প্রভৃতি স্থলে এমন মানুষ আছে যাহারা আমাদের দৃষ্টিতে এখনও বন্যজীব। তাহাদের আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, চিন্তাপ্রণালী কিছুই সভ্যমানবের মত নহে। মানুষ ছাড়া অপর জীবের মধ্যে উৎকর্ষতার তারতম্য এত অধিক কোথাও নাই।

এরূপ তারতম্য কেন হয়? আগে একটা মস্তিষ্ক থিওরি ছিল অর্থাৎ মস্তিষ্ক পদার্থের তারতম্য অনুসারে মানুষের তারতম্য বা জীবের তারতম্য ঘটে। এ থিওরি আর চলেনা কারণ উহা এখন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আর একটা থিওরি এই যে মানবের আদিম অবস্থায় অর্থাৎ উহাদের আমরা যে অবস্থায় এখন অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাই, আপন জাতি, (১) কুল (২) বা গোত্রের (৩) মধ্যে পরস্পর সাহচর্য্যে থাকিত কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা ক্রমশঃ অপর জাতি, কুল বা গোত্রে পরিণত হইত। এই অবস্থায় নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন ফল মূল অথবা জীবজন্তু প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী হ্রাস হইয়া পড়িত তখন এক জাতির সহিত অপর জাতির যুদ্ধ বাধিত এবং যে জাতি অধিক বুদ্ধিমান ও বলশালী তাহারা অপর পক্ষকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইত, তাহাদের স্ত্রীলোকদের অধিকার করিয়া লইত ও পুরুষগুলাকে দাস করিত। যুদ্ধে যাহারা নির্জীব তাহারা মরিয়া যাইত এবং নেতাদের মধ্যে যাহারা গণ্য তাহারা স্ত্রীলোকগুলিকে বাছিয়া লইয়া নিজের করিয়া লইত। ইহার ফলে উপযোগীতার সংরক্ষণ বা "সরভাইভ্যাল অব দি ফিটেষ্ট" হইত। এই উপযোগী পুরুষরমণী সংযোগে যে নূতন প্রজা সৃষ্ট হইল তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা উন্নত। কিসে উন্নত—বুদ্ধিতে ও শরীরে। প্রবাদটি এখনও চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এরূপ ভাবে ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে কোনও জাতির উৎকর্ষতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। অসভ্যেরা সেই ভাবেই এখনও যুদ্ধ চালাইতেছে, একদল জিতিতেছে, তাহারা অপর দলের পূর্ব্বোক্ত ভাবেই সমস্ত লইতেছে কিন্তু নূতন উৎকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি কই?

যাহা হউক যখন সভ্য মানুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে একটা কোন কারণে উন্নত জাতির অভ্যুদয় হয়। উন্নত মানবের সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং উহা তত আদৃত নয় বলিয়া উহার কথা সংক্ষেপে বলিব।

---

(১) Horde.
(২) Tribe.
(৩) Totem.